আহমাদ মোস্তফা কামাল

শিল্পের শক্তি শিল্পীর দায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পের শক্তি, শিল্পীর দায়

আহমাদ মোস্তফা কামাল

Adorn
অ্যাডর্ন পাবলিকেশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪১৬

শিল্পের শক্তি, শিল্পীর দায় ❖ আহমাদ মোস্তফা কামাল
প্রথম প্রকাশ ❖ ফেব্রুয়ারি ২০১০
প্রকাশক ❖ সৈয়দ জাকির হোসাইন ❖ অ্যাডর্ন পাবলিকেশন
২২ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০ বাংলাদেশ। ফ্যাক্স : ৯৩৬২৯৪৯ ফোন : ৯৩৪৭৫৭৭, ৮৩১৪৬২৯
চট্টগ্রাম অফিস : ৩৮, এন.এ. চৌধুরী রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম ৪০০০। ফোন : ৬১৬০১০
মুদ্রণ ❖ প্যানটোন কালার পয়েন্ট এন্ড এক্সেসরিজ, ১১/৩, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব ❖ লেখক
প্রচ্ছদ ❖ সাইম রানা
মূল্য ❖ একশত সত্তর টাকা মাত্র

Shilper Shokti, Shilpir Dai ❖ Ahmad Mostofa Kamal
A Collection of Articles in Bengali
Published in February 2010
by Syed Zakir Hussain ❖ Adorn Publication
22 Segun Bagicha, Dhaka-1000, Bangladesh. Fax : 9362949 Tel : 9347577, 8313019
website : www.adornbd.com e-mail : adorn@bol-online.com
Copyright : Author
Cover design : Sayeem Rana
Price : Tk. 170.00 US $ 10 UK £ 8

ISBN 978-984-20-0094-2
AP- 294-2010

All rights reserved. No Part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Adorn Publication.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

আমার শিক্ষক

বাবু হরিপদ সূত্রধর শ্রদ্ধাস্পদেষু

বহুকাল আগে আপনার এক কিশোর ছাত্রের লেখা পড়ে আপনি বলেছিলেন—
'লেগে থাকিস, লেগে থাকলে তোর হবে।'
আমি এখনো লেগে আছি, কিন্তু কিছু হচ্ছে কি না, বুঝতে পারছি না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

ভূমিকা ৯

প্রথম পর্ব

শিল্প ও শিল্পী সম্পর্কে কিছু বোঝাপড়া ১১-৫১

জনপ্রিয় সাহিত্য, জনপ্রিয়তার সাহিত্য ১৩
সমালোচনা, সমালোচক ও পাঠক ৩১
শিল্পের শক্তি, শিল্পীর দায় ৪২

দ্বিতীয় পর্ব

বাংলাদেশ : সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি...৫৩-১০৪

রাজনীতির দর্শন ও কর্মসূচি ৫৫
বাঙালির সংস্কৃতিচিন্তা ৭৭
ইতিহাসের বিকৃতি, ইতিহাসের কারচুপি ৯৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

নানা সময়ে নানা বিষয়ে নানা ভাবনা মনে আসে, সে-সবের অধিকাংশই অবহেলায় হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতলে। কখনোবা দু-চার পঙক্তি টুকে রাখি, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রূপ আর দেয়া হয়ে ওঠে না। আবার সময়-সুযোগ পেলে বা খুব বেশি উদ্দীপ্ত বোধ করলে হয়তো কোনো-কোনো চিন্তা লিখিত রূপ পায়। তেমনই কিছু রচনার সংকলন এই বইটি। বিভিন্ন সময়ে লেখা এসব রচনার বিষয়-সাদৃশ্য হয়তো নেই, তবু একত্রিত করে প্রকাশ করার সাহস করলাম আমার প্রথম প্রবন্ধ সংকলন *সংশয়ীদের ঈশ্বর*-এর অপ্রত্যাশিত গ্রহণযোগ্যতার কারণে। অনেক সংকোচ, দ্বিধা ও সংশয় নিয়ে ওটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বছর চারেক আগে। এই ধরনের বিষয়াদি নিয়ে লেখা একজন তরুণ লেখকের বই পাঠকরা কীভাবে গ্রহণ করবেন, বা আদৌ করবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় ও সন্দেহ ছিল। কিন্তু বিস্ময়করভাবে পাঠকরা অভাবিত সাড়া দিয়েছেন। এতটা সাড়া পাবো, তা কল্পনায়ও ছিলো না। বেরুবার দু-বছরের মাথায় ওটার প্রথম সংস্করণ ফুরিয়ে যায়; দ্বিতীয় সংস্করণেও চমৎকার সাড়া পেয়েছি। আমার হাতে-গোনা স্বল্পসংখ্যক পাঠক বইটি পড়ে তাদের মূল্যবান মতামত আমাকে জানতে দিয়েছেন, নানা সময়ে নানা জায়গায় রেফারেন্স হিসেবে বইটির নাম উল্লেখ করেছেন, নিজে পড়েছেন এবং অন্যকেও পড়তে উৎসাহিত করেছেন—এসবই আমার জন্য বড়ো আনন্দময় ও প্রীতিকর অভিজ্ঞতা। বিচ্ছিন্ন বিষয়াদির মধ্যেও যে আসলে ঐক্য থাকে, পাঠকরা সেটি ঠিকই বুঝে নিয়েছেন বলে এই বইটিও তাদের হাতে তুলে দেবার সাহস করছি।

২

প্রায় দু-দশক ধরে গল্প-উপন্যাস লিখে চলেছি; বেশ কয়েকটি বইও বেরিয়েছে। লিখেছি সাহিত্য-বিষয়ক অনেক প্রবন্ধও। সেগুলো বইতে সংকলিত হয়নি বটে, তবে আমার পাঠকরা আমার ওই ধরনের লেখালেখির সঙ্গেও পরিচিত। কিন্তু বারবার অনুভব করেছি গল্প-উপন্যাসে বা সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধে আমি আমার সব চিন্তাকে জায়গা করে দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারছি না। সেজন্যেই ভিন্ন ধরনের কিছু লেখার জন্ম হয়েছে; *সংশয়ীদের ঈশ্বর* এবং এই বইতে সেগুলো সংকলিত হয়েছে। এই লেখাগুলোর জন্ম প্রধানত প্রশ্ন থেকে। অনেক 'মীমাংসিত' বিষয়েও মনের মধ্যে প্রশ্নের জন্ম হয়, আর কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হলে সেটি আর মীমাংসিত থাকে না, হয়ে ওঠে অমীমাংসিত। তখন একটা মীমাংসা খোঁজার চেষ্টা চলে, অনেকটা যেন নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে বিষয়গুলো সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা। হয়তো সবক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত মীমাংসা খুঁজে পাওয়া যায় না, বা কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না, তবু প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবতে ভালো লাগে, সেগুলো অনেকের কাছে পৌঁছে দিতেও ভালো লাগে। পাঠকরা যখন এইসব বিক্ষিপ্ত ভাবনায় সাড়া দেন তখন আনন্দ হয়, উদ্দীপ্ত বোধ করি। এই বইয়ের লেখাগুলো যদি আমার পাঠকদেরকে বিষয়গুলো সম্বন্ধে নতুন করে ভাবার জন্য কিছুটা হলেও উদ্দীপ্ত করতে পারে, সেটিকেই আমি আমার প্রাপ্তি হিসেবে ধরে নেব।

৩

একজন তরুণ লেখকের প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশ করতে হলে আর্থিক ঝুঁকি নিতে হয়। অ্যাডর্ন-এর প্রকাশক সৈয়দ জাকির হোসাইন এবং বন্ধু কথাশিল্পী রাখাল রাহার আগ্রহ ও ভালোবাসায় সেই ঝুঁকি সত্ত্বেও বইটি বেরুচ্ছে। এই সম্মান ও ভালোবাসাটুকু খুব উপভোগ করেছি। লেখকরা সম্ভবত এর চেয়ে বেশি কিছু চানও না! তাঁদেরকে আলাদাভাবে ধন্যবাদ দেবার প্রয়োজন নেই, সেটি তারা এমনিতেই বুঝে নেবেন, জানি আমি।

ডিসেম্বর, ২০০৯ **আহমাদ মোস্তফা কামাল**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্র থ ম প র্ব

শিল্প ও শিল্পী সম্পর্কে কিছু বোঝাপড়া

জনপ্রিয় সাহিত্য, জনপ্রিয়তার সাহিত্য
সমালোচনা, সমালোচক ও পাঠক
শিল্পের শক্তি, শিল্পীর দায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনপ্রিয় সাহিত্য, জনপ্রিয়তার সাহিত্য

বাংলাদেশের সাহিত্যে জনপ্রিয় ধারাটি ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। এ নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়, তর্ক-বিতর্ক হয়, জনপ্রিয় লেখকরা একইসঙ্গে আত্মগরিমা ও আত্মগ্লানিতে ভোগেন। তাদের বই প্রচুর বিক্রি হয়, বইমেলায় তাদেরকে নিয়ে পাঠকদের উচ্ছ্বাস রীতিমতো ক্রেজের পর্যায়ে পৌঁছেছে— তারা তো আত্মগরিমায় ভুগতেই পারেন! কিন্তু গ্লানিতে ভোগার কারণটা কী? অবশ্য এ প্রশ্ন উঠতেই পারে— তারা যে গ্লানিতে ভোগেন, তার প্রমাণ কি? এ নিয়ে একটু পরেই কথা বলা হবে, এখন শুধু এটুকু বলি— নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য তাদের নির্লজ্জ প্রচেষ্টা দেখেই বোঝা যায়, নিজেদেরকে তারা কতোটা গুরুত্বহীন ভাবেন! এই গুরুত্বহীনতার অনুভূতি থেকেই জন্ম নেয় গ্লানি, আর সেটাকে প্রতিরোধ করার জন্য নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করার দৃষ্টিকটূ চেষ্টা। এ যেন এক স্বনির্মিত চক্র, যা থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। তো, তারা যে গ্লানিতে ভোগেন, তার কারণ সম্ভবত এই যে, সাহিত্যের আলোচনায় অধিকাংশ সময়ই তাদের নামগুলো উপেক্ষিত থাকে, এমনকি তাদের কারো-কারো কিছু ভালো লেখাও অনালোচিতই থেকে যায়! সব পেশাজীবীদের যেমন নিজস্ব কমিউনিটি থাকে— শ্রমিকদের কমিউনিটি, চিকিৎসক-প্রকৌশলী-সাংবাদিক-শিক্ষকদের কমিউনিটি, নাট্যজন-চলচ্চিত্রশিল্পীদের কমিউনিটি, সামরিক-বেসামরিক আমলাদের কমিউনিটি, রাজনীতিবিদদের কমিউনিটি, ইত্যাদি ইত্যাদি— লেখকদেরও তেমনই এক অলিখিত-অপ্রকাশ্য কমিউনিটি আছে। অপ্রকাশ্য, কারণ, এই কমিউনিটির কোনো সাংগঠনিক কাঠামো নেই, তারা ঠিক পেশাজীবীও নন, বছর শেষে তারা পিকনিক করতে যান না, বা কারণে-অকারণে 'পার্টি থ্রো' করেন না। তবু লেখকরা পরস্পরকে নিজেদের মানুষ বলেই মনে করেন, যেমন শিক্ষকরা মনে করেন শিক্ষকদের, আমলারা আমলাদের ইত্যাদি। যদিও লেখকদের মধ্যে পাস্পরিক বিরোধের (অধিকাংশ সময়ই সেগুলো মতাদর্শগত বিরোধ বা নন্দনতাত্ত্বিক বিরোধ, ব্যক্তিগত নয়) ঘটনাও প্রচুর, পত্রপত্রিকায় সেগুলোর ফলাও প্রচারণাও হয়, তবু এই 'কমিউনিটি ফিলিং' টের পাওয়া যায়, যখন, যে-কোনো একজন লেখকের যে-কোনো ধরনের বিপর্যয়ে অন্য লেখকরা সব বিরোধ ভুলে এগিয়ে আসেন! তো, জনপ্রিয় লেখকরা যখন দেখেন নিজেদের কমিউনিটিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁদের নামটিও সহজে উচ্চারিত হয় না, তখন তারা পীড়ায় ভোগেন, গ্লানিতে ভোগেন। যে-কোনো জনপ্রিয় তারকার মতোই তারাও সমাজে সম্বর্ধিত মানুষ, অনুষ্ঠানে-আয়োজনে তাদের উপস্থিতি ভিড় বাড়িয়ে দেয়, পত্র-পত্রিকার কাটতি বাড়িয়ে দেয় তাদের লেখা, প্রকাশকরা তাদের পেছনে লম্বা লাইন দিয়ে পড়ে থাকেন, অথচ এতকিছুর পরও সতীর্থ লেখকরা তাদেরকে যথার্থ সম্মান দেন না, ব্যাপারটাতো পীড়াদায়কই হবার কথা! তবে বিষয়টি আরো পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে যখন তারা আবিষ্কার করেন— তাদের জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়তে শুরু করেছে, অন্য অনেকে এসে তাদের জনপ্রিয়তায় ভাগ বসাচ্ছে। তারা ভুলে যান যে, 'জনপ্রিয়তা' নামক বিষয়টির এটিই প্রধান বৈশিষ্ট্য। একজন জনপ্রিয় লেখক, একজন জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী, একজন মাঠ-কাঁপানো জনপ্রিয় খেলোয়াড়ের শেষ পরিণতিতে মূলগত কোনো পার্থক্য নেই। একসময় তাঁরা থাকেন সমস্ত আয়োজনের কেন্দ্রবিন্দুতে, সমাজের শীর্ষবিন্দুতে থাকে তাদের অবস্থান, কিন্তু একসময় তারা হারিয়ে যেতে থাকেন বিস্মৃতির অতলে। এটি জনপ্রিয়তার বৈশিষ্ট্যের কারণেই ঘটে। জনপ্রিয়তা কখনোই চিরস্থায়ী ব্যাপার নয়, এমনকি দীর্ঘস্থায়ীও নয়, বরং নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী বিষয়। 'জনপ্রিয়' মানুষরা তাদের জনপ্রিয়তার তুঙ্গ মুহূর্তে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ভুলে যান, ফলে যখন ধস নামতে শুরু করে তখন ভেঙে পড়েন, কষ্ট পান, আহত হন। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জনপ্রিয় মানুষই জীবনকালেই তাদের জনপ্রিয়তার মৃত্যু ঘটতে দেখে যান। মজার ব্যাপার হলো এই যে, যিনি যতো দ্রুত প্রতিষ্ঠা পান, খ্যাতি লাভ করেন, জনপ্রিয়তার চূড়ায় আহরণ করেন, তিনি ততোই দ্রুত পতিত হন! (একজন ক্রিকেটারের কথা ভাবুন। ঘটনাক্রমে কোনো একটি ম্যাচে একটি শক্তিশালী দলের বিপক্ষে একজন ব্যাটসমান একটা সেঞ্চুরি যদি করেই ফেলেন, এবং বিশেষ করে এটি যদি হয় ম্যাচ-উইনিং সেঞ্চুরি, তাহলে পরদিন তিনি সারা পৃথিবীর সমস্ত মিডিয়ায় শিরোনামে চলে আসেন! এক সেঞ্চুরিতেই একদিনে বিশ্বখ্যাতি! কিন্তু কদিনের এই খ্যাতি?) অবশ্য অন্য মাধ্যমের জনপ্রিয়তার চেয়ে সাহিত্যে জনপ্রিয়তার ব্যাপারটা বোধহয় একটু আলাদা। এমন হঠাৎ-খ্যাতি, হঠাৎ-জনপ্রিয়তা সাহিত্যে সম্ভব নয়, খানিকটা সময় লাগে এতে, ফলে পতন ঘটতেও খানিকটা বেশি সময় লাগে।

জনপ্রিয়তা নিয়ে কথা বলতে গেলে এরপরই আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে হবে। সেটি হলো— এই যে জনপ্রিয়তা, সেটি কী ওই লেখকের নাকি তার লেখার? প্রশ্নটি অন্য মাধ্যমে সম্বন্ধেও করা যেতে পারে। একজন অভিনেতার জনপ্রিয়তা কী তার নিজের নাকি তার অভিনয়ের? কণ্ঠশিল্পীর জনপ্রিয়তা কী তার গায়কীর না তার নিজের? কিংবা আরো সংক্ষেপে, মাত্র একবাক্যেই প্রশ্নটি করা যায়— শিল্প ও জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গটি যখন ওঠে, তখন আমরা কী শিল্পের জনপ্রিয়তার কথা বলি নাকি শিল্পীর?

২

এই রচনায় আমরা যেহেতু সাহিত্যের জনপ্রিয়তা নিয়ে কথা বলতে আগ্রহী, অন্যান্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয় নিয়ে তাই একটু কমই কথা বলবো, দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো সাহিত্য ও লেখকদের জনপ্রিয়তা নিয়ে।

সাহিত্যে জনপ্রিয়তা কোনো নতুন বিষয় নয়। সাহিত্যের ইতিহাসে অনেক আগে থেকেই জনপ্রিয় লেখক ছিলেন, জনপ্রিয় লেখাও ছিলো। তবে সময়ের সঙ্গে জনপ্রিয়তার ধরন পাল্টেছে, বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে জনপ্রিয় সাহিত্য-চর্চার ধরন-ধারণ সাহিত্য-ইতিহাসের কোনো পর্বের সঙ্গেই মেলানো যায় না! বাংলা সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। সম্ভবত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম 'জনপ্রিয়' লেখক; এবং বিস্ময়কর হলো এই যে, মৃত্যুর এত বছর পরও তাঁর জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন রয়েছে। তাঁর এই অভাবিত পাঠকপ্রিয়তার বিষয়টি নিয়ে ভাববার অবকাশ আছে। তাঁকে উপেক্ষা করাটা এখন একটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু যিনি প্রায় এক শতাব্দী ধরে একটি ভাষার আপামর পাঠকগোষ্ঠীকে মোহমুগ্ধ করে রাখতে পারেন— তাঁর ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। সম্ভবত বাংলাসাহিত্যের তিনিই প্রথম এবং এখন পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী পাঠকপ্রিয় লেখক। তাঁর পরেও আরো অনেক জনপ্রিয় লেখক এসেছেন— ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, শংকর, জরাসন্ধ, যাযাবর (এমনকি রোমেনা আফাজ বা আকবর হোসেনও একসময় খুব জনপ্রিয় ছিলেন)— কিন্তু প্রায় সকলেই এখন বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে বসেছেন। শরৎচন্দ্র যে শুধু তাঁর জীবনকালেই জনপ্রিয়তার স্বাদ পেয়েছিলেন তা নয়, বরং মৃত্যুর এই এতদিন পরও তাঁর জনপ্রিয়তায় এতটুকু ভাটা পড়েনি। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে বলা চলে, জনপ্রিয় সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে এমন একটি বাড়িও খুঁজে পাওয়া যাবে কীনা সন্দেহ, যেখানে একজন/দুজন শিক্ষিত লোক আছেন অথচ শরৎচন্দ্রের একটি/দুটি লেখা পড়েননি। এই বিস্ময়কর পাঠকপ্রিয়তার কারণ কী? একথা সবাই স্বীকার করবেন যে, শরৎচন্দ্রের বিষয়-নির্বাচন এবং বর্ণনাভঙ্গিতে এমন এক জাদু আছে যে পাঠককে তা আবেগপ্রবণ করে তুলবেই। তাঁর গল্প-উপন্যাস পড়বেন আর চোখের কোণে জল জমবে না— এমন পাষাণ-হৃদয় পাঠক এখনো বাঙালি জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেনি, করবে কীনা তা-ও সন্দেহ! তাঁর লেখা পড়ে ওই সময়ও পাঠকরা কেঁদেছে, আজও পাঠকরা কাঁদে, ধারণা করি আগামীতেও কাঁদবে। জানি, অজর-অনড় পক্বকেশ অধ্যাপকরা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলবেন— পাঠককে কাঁদানো কোনো লেখকের উদ্দেশ্য হতে পারে না, কেউ তা করতে সক্ষম হলেও সেটাকে লেখকের সাফল্য বলে বর্ণনা করা উচিত নয়! মানছি এ কথা। কিন্তু ওই দাঁত-মুখ খিচানো অধ্যাপকও যে শরৎচন্দ্রের লেখা পড়ে কেঁদেছেন (হয়তো কিশোর-কিশোরীদের মতো বা নরম মনের তরুণ-তরুণীদের মতো বা জীবনযুদ্ধে পরাজিত পরিণত বয়সের বিপন্ন মানুষটির মতো কেঁদে বুক ভাসাননি, কিন্তু তার চোখ যে ভিজে উঠেছে সে ব্যাপারে আমি শতভাগ নিশ্চিত), এর ব্যাখ্যা কী? মোট কথা— পাঠক যে ধরনেরই হোন না কেন, শরৎচন্দ্রের লেখা যে তার কোমল অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে, সেটা অস্বীকার করা যাবে না। আর তাঁর সাফল্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওখানেই। সম্ভবত শরৎচন্দ্রই প্রথম লেখক যিনি বাঙালির আবেগ-আকাঙ্ক্ষার স্থানগুলো সূক্ষ্মভাবে চিহ্নিত করে সেগুলোকে নিপুণ দক্ষতায় ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। একজন মানুষের যেমন কিছু স্পর্শকাতর বিন্দু থাকে— সেসব বিন্দুতে আঘাত পেলে, এমনকি স্পর্শ পেলেও সে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে; রেগে যায়, স্মৃতিকাতর হয়, উচ্ছ্বসিত হয়, বা চোখ ভিজে ওঠে— তেমনি একটি জাতিরও সেরকম কিছু স্পর্শকাতর আবেগবিন্দু থাকে। সেই আবেগবিন্দুগুলোকে চিনে নেয়া অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার। শরৎচন্দ্র হচ্ছেন বিশ্বসাহিত্যের সেই বিরলতম লেখক যিনি একটি জাতির তেমনই একটি আবেগবিন্দুকে খুব ভালোভাবে শনাক্ত করেছিলেন আর নিজের করণ-কৌশলকে সেই বিন্দুর অনুগামী করে তুলেছিলেন। তিনি জেনে ফেলেছিলেন, ঠিক কোন বিন্দুতে টোকা পড়লে বাঙালির চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। আর এই জাতির অন্তর্গত পাঠকরা তাঁর লেখায় নিজেদের আবেগ-বিন্দুটিকে আবিষ্কার করে বলেই শরৎচন্দ্র এখনো এত বিপুলভাবে পঠিত হন। তিনি যে শুধু আবেগকে উসকে দেবার জন্যেই লিখেছেন, একথা বললেও তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। বরং পারিবারিক-সামাজিক জীবনপ্রবাহের দৃশ্যবহুল বর্ণনা দিয়েছেন; প্রয়োজন মতো বিষয়গুলোকে নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন; বাংলার গ্রাম, বাংলার প্রকৃতি অনুপুঙ্খ বর্ণনায় ধরা পড়েছে তাঁর লেখায়; সামাজিক কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসগুলোকে নির্মমভাবে আঘাত করেছেন তিনি ইত্যাদি। তবু আমার মনে হয়, তাঁর সাফল্য নিহিত আছে বাঙালির আবেগকে চমৎকারভাবে ধারণ করার মধ্যে। অর্থাৎ, ব্যক্তি শরৎ নন, বরং তাঁর সাহিত্যের উপাদানই তাঁকে এখন পর্যন্ত জনপ্রিয় করে রেখেছে।

প্রশ্ন উঠতেই পারে— সব লেখকের বেলায়ই কী কথাটি সত্য নয়? অর্থাৎ, লেখক নিজে নন, বরং তাঁর লেখাই জনপ্রিয় হয়, এটিই কী সত্য নয়? না, এটি সর্বাংশে সত্য নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সাম্প্রতিককালের জনপ্রিয় লেখকরা শুধু তাদের লেখা নিয়েই পাঠক-দরবারে হাজির হন না, সঙ্গে থাকে হরেক রকম ক্যারিশমা। রঙচঙে বিজ্ঞাপন, টেলিভিশনে নানা ধরনের আয়োজন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, এমনকি 'পাঠকদের কথা' ভেবে এইসব লেখকদেরকে সিনেমার তারকাদের সঙ্গে রান্নাবান্নার অনুষ্ঠানেও অংশ নিতে দেখা যায়! এক্ষেত্রে বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করে টেলিভিশনের নাটক। যার নাটক যতো জনপ্রিয়, তিনি লেখক হিসেবেও ততোই জনপ্রিয়। এ বিষয়ে আমরা একটু পরই আরো বিস্তারিত আলাপ করবো।

শরৎ-পরবর্তী জনপ্রিয় লেখকদের এই রূপ পরিবর্তন কিন্তু একদিনে হয়নি। শুধুমাত্র জনপ্রিয় হবার জন্য লেখালেখি করা এই সেদিনের ঘটনা। এর আগ পর্যন্ত লেখকরা লিখতেই আসতেন, ঘটনাক্রমে জনপ্রিয় হয়ে যেতেন, তারপর হয়তো সেই জনপ্রিয়তার ফাঁদে পড়তেন। যাযাবর, শংকর, বিমল মিত্র, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়— সবাই এই ধরনের লেখক। এমনকি আমাদের দেশের আকবর হোসেনও তাই। তিনি তাঁর ক্ষমতা অনুযায়ী 'ভালো' লেখাটিই লিখেছেন, এরচেয়ে ভালো কিছু করার ক্ষমতাই তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলো না। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ধারাটিরও পরিবর্তন হয়েছে।

শরৎ-পরবর্তী লেখকদের মধ্যে সৈয়দ মুজতবা আলীর জনপ্রিয়তাই সর্বাধিক। তাঁর অভাবিত জনপ্রিয়তা এখন পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকার কারণটি জটিল নয়। হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে তিনি যে রমনীয়তা উপহার দিয়েছেন, বাংলাসাহিত্যে তার তুলনা বিরলপ্রায়। হাসতে হাসতেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁর গভীর উপলব্ধির কথা। এরকম লেখককে ভালো না লেগে উপায় কী?

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিভাবান লেখক সমরেশ বসুর বোধহয় দুটো হাত, দুটো মন, দুটো কলম ছিলো। এক হাতে লিখতেন 'গঙ্গা'র মতো লেখা, অন্য হাতে 'বিবর' বা 'প্রজাপতি'র মতো লেখা। তিনি নিশ্চিতভাবেই জানতেন, কোন লেখাটি 'জনপ্রিয়' হবে, কোনটি হবে না। কোন উপাদানগুলো থাকলে আপামর জনতা লেখাটিকে লুফে নেয়, সেটি তাঁর ভালো করেই জানা ছিলো।

সমরেশ বসুর ধারাবাহিকতায় আরেক পশ্চিমবঙ্গীয় প্রতিভা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তিনিও একহাতে রচনা করেন 'একা এবং কয়েকজন'-এর মতো দুর্দান্ত উপন্যাস, অন্য হাতে লেখেন অসংখ্য সাহিত্যমূল্যহীন সুড়সুড়িমার্কা পুস্তক! সুনীলের প্রতিভার সাক্ষর শুধুমাত্র উপন্যাসে নয়, প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। একইসঙ্গে আছে প্রতিভার বিপুল অপচয়ের সাক্ষরও! তাঁকে বলা যেতে পারে অপচয়িত প্রতিভার প্রকৃষ্টতর নিদর্শন! সহজ-সরল ভঙ্গি, মেদহীন-কমিউনিকেটিভ ভাষা তাঁর গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কবি হয়েও তিনি কবিতার প্রভাব পড়তে দেননি তাঁর গল্প বা উপন্যাসে। গল্পে যেমন, তেমনি উপন্যাসেও তিনি প্রভাব তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর 'একা এবং কয়েকজন' বাংলা সাহিত্যের এক মাইলফলক উপন্যাস। সেই তুলনায় তাঁর অতি বিখ্যাত ট্রিলজি 'পূর্ব পশ্চিম' 'সেই সময়' 'প্রথম আলো' দুর্বল রচনা— যদিও 'পূর্ব পশ্চিম' উপন্যাসের আঙ্গিক পরবর্তীকালের অনেক লেখককে প্রভাবিত করেছে এবং কোনো এক অজ্ঞাত কারণে আঙ্গিকটি বাংলাদেশের লেখকদের পছন্দ হয়ে গেছে! হুমায়ূন আহমেদের 'জোছনা ও জননীর গল্প', আনিসুল হকের 'মা' এই ধারার উপন্যাস। এমনকি সৈয়দ হকের 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' প্রথম সংস্করণে যেমন ছিলো, দ্বিতীয় সংস্করণে তেমনটি নেই, 'পূর্ব পশ্চিমে'র আঙ্গিক গ্রহণ করা হয়েছে এই উপন্যাসেও! অর্থাৎ, সুনীল নিজেই শুধু একটি ব্যর্থ-দুর্বল উপন্যাসের জন্ম দেননি, আরো কিছু অসফল উপন্যাসের জন্ম-প্রক্রিয়াকে তরান্বিত ও উৎসাহিত করেছেন। আর এখানেই সুনীলের প্রভাব-প্রতিপত্তি টের পাওয়া যায়। একজন লেখকের অসফল একটি উপন্যাসের যদি এতখানি অনুকরণ হয়, তাহলে তাঁর প্রভাব যে কতোদূর পর্যন্ত বিস্তৃত সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সুনীলের সমসাময়িক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের অবস্থা আরো জটিল! অসাধারণ গদ্যভঙ্গি তাঁর, চরিত্রচিত্রণে দারুণ পারঙ্গম, কাহিনীর জটিলতা তৈরিতে ওস্তাদ লোক, ঘটনার বিকাশে তাঁর সাবলীলতা রীতিমতো ঈর্ষণীয়। এতগুলো গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি একজন প্রথমসারির কথাশিল্পী হয়ে উঠতে পারলেন না শুধুমাত্র পাঠকদের সুখী করবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচিত্র মানসিকতার জন্য। তার প্রায় নব্বইভাগ উপন্যাসের উপসংহার প্রাচীন রূপকথার মতো– অবশেষে তাহারা সুখে-শান্তিতে বাস করিতে লাগিলো! পুরো উপন্যাসে যে জটিলতা তিনি তৈরি করেন, মনে হয়, এই মানুষগুলোর পক্ষে বাস্তবতার এই দুর্ভেদ্য চক্র থেকে কোনোভাবেই বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। অথচ শেষে এসে দেখা যায়— লেখকের কারসাজিতে সবাই সুখে আছে, সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে! বাস্তব জীবনে এসব সমস্যার সমাধান হয় না, মানুষ দুর্ভেদ্য চক্র থেকে বেরুতে পারে না কোনোভাবেই, অথচ তিনি তাই করে দেখান। পাঠকও সুখ পান তাতে। বাস্তব জীবনে যা ঘটে না, উপন্যাসের পাতায় তা ঘটতে দেখলে ভালো লাগে বৈকি! সুখপিয়াসী পাঠকের ইচ্ছামুখী লেখক বলতে যা বোঝায়, শীর্ষেন্দু তার চমৎকার উদাহরণ!

এরকম আরো কয়েকজন থেকে থাকবেন। তাদের কথা ছেড়ে এবার বরং আমরা বাংলাদেশের দিকে ফিরে তাকাই। তার আগে একটা ব্যাপার বলে নেয়া ভালো— সমরেশ, সুনীল, শীর্ষেন্দু এঁরা সবাই সাহিত্যের মূলধারার লেখক। অর্থাৎ তারা শুরু করেছিলেন এবং সচল থেকেছেন মূলধারাতেই, কেবল মাঝে মাঝে জনরুচির কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেদের সাহিত্যকীর্তিতে কালিমা লেপন করেছেন, এই যা!

৩

বাংলাদেশে জনপ্রিয় সাহিত্যের জন্ম হয় হুমায়ূন আহমেদ এবং ইমদাদুল হক মিলনের হাতে। তবে একটা কথা শুরুতেই পরিষ্কার করে নেয়া দরকার। সেটা হলো— পশ্চিমবঙ্গের সমরেশ-সুনীলের মতো বাংলাদেশের এই দুই লেখকও সাহিত্যের মূলধারার লেখক হিসেবেই শুরু করেছিলেন। কেবলমাত্র জনপ্রিয় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে লেখালেখির জগতে আগমন ঘটেনি তাঁদের। পরবর্তীকালে তাঁদের লেখা ভিন্ন ভিন্ন পাঠকগোষ্ঠী বিপুলভাবে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরাও সেই পাঠকদের চিত্তবিনোদনের কথা মাথায় রেখে তাদের মনমতো পুস্তক রচনা করছেন বটে, কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা চলেছে অনেকদিন ধরে, ধীরে ধীরে। হুমায়ূনের প্রথম বই প্রকাশিত হয় সত্তর দশকের শুরুতে, আর তিনি জনপ্রিয় হতে শুরু করেন আশির দশকের মাঝামাঝি। অর্থাৎ প্রায় দেড়-দশকের ব্যবধানে তাঁর জনপ্রিয়তার ব্যাপারটা চোখে পড়তে শুরু করে। মিলনও সত্তরের মাঝামাঝি থেকে শুরু করলেও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন আশির মাঝামাঝিতেই। প্রথম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত দুজনই মূলধারার পত্রপত্রিকায় নিজেরা লিখে চলেছেন, অন্যদের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছেন, সাহিত্যসমাজ তাঁদেরকে যতোই প্রত্যাখান করার চেষ্টা করুক না কেন, তাঁদের সম্বন্ধে নীরব থাকতে পারেনি। একজন লেখক সম্বন্ধে আপনি যদি সোচ্চার হয়ে ওঠেন, সেটি ইতিবাচকই হোক বা নেতিবাচকই হোক, বুঝতে হবে— ওই লেখককে আপনি গুরুত্ব দিচ্ছেন, নইলে তার সম্বন্ধে কথাই বলতেন না (আমরা কিন্তু এইসব আলোচনায় আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন টাইপের কোনো লেখকের নামও উচ্চারণ করি না!)। এবং মজার ব্যাপার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো এই যে, এই দুজনের 'জনপ্রিয়' সাহিত্যের তুলোধুনো-সমালোচনা করার পর মনে একটু খুঁতখুঁত করতে থাকে এই জন্য যে, তাঁদের অসাধারণ রকমের ভালো কিছু লেখা আছে, তুলোধুনো করার সময় সেগুলোর কথা বলা হয়নি! শক্তিমান লেখকদের শক্তিটা এখানেই যে, তাদের সম্বন্ধে একটি অবস্থান নিতে হয়— ইতিবাচক বা নেতিবাচক— এড়িয়ে যাওয়া যায় না! আমরা যে তাদেরকে এড়িয়ে যাই না, তার কারণও হয়তো এই যে, যতোই 'জনপ্রিয়তা'র মোহে তারা নিজেদের অপচয় করুন না কেন, তারা আসলে মূলধারারই লেখক। তাদের বাদ দিয়ে বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়! ফাল্গুনী-শংকরকে বাদ দিয়েই আপনি পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করলে ইতিহাস বা সাহিত্যের কোনোটিরই তেমন কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু সমরেশ-সুনীলকে বাদ দিয়ে আপনি ইতিহাস রচনাই করতে পারবেন না! জেদের বশে করে ফেলতে পারেন, সেটি ইতিহাসও হবে না, সাহিত্যও হবে না, হবে আপনার জেদের ইতিহাস! তেমনই বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সময় আপনি চোখ বন্ধ করে আকবর-মুসলেহউদ্দীনের নাম বাদ দিতে পারেন, কিচ্ছু যাবে-আসবে না, কিন্তু হুমায়ূন-মিলনকে বাদ দেবেন? দিতে পারেন, কিন্তু সেই ইতিহাস হাস্যকর বলে বিবেচিত হবে। এত কথা বললাম একটা বিশেষ কারণে— যাদের হাতে বাংলাদেশের জনপ্রিয় সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল, তাদের অবস্থাটা ঠিকমতো বুঝতে পারলেই সাম্প্রতিককালের জনপ্রিয় সাহিত্যের রূপটা বোঝা যাবে।

সাম্প্রতিককালের জনপ্রিয় সাহিত্য-চর্চা নিয়ে কথা বলার আগে হুমায়ূন-মিলন সম্বন্ধে আরো কিছু কথা আমাদের বলে নিতে হবে! এই দুজন একই সময়ে শুরু করলেও দুজনের জনপ্রিয়তার ধরন ভিন্ন। হুমায়ূন আহমেদ, বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন। তাঁর প্রথম দুটো উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' এবং 'শঙ্খনীল কারাগার' আমাদেরকে যে ছবি উপহার দিয়েছিল, সেটি এর আগে আর কখনো বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়নি। মধ্যবিত্ত জীবনের এমন ছোটখাটো অনুষঙ্গও যে উপন্যাসের বিষয় হতে পারে, সেটি এই উপন্যাস দুটোর আগে কে-ই বা ভাবতে পেরেছিল? আর এই জীবনকে এর খুঁটিনাটিসহ এমন গভীরভাবে চেনার প্রমাণই বা আর কে দিতে পেরেছিলেন, হুমায়ূনের আগে? আমাদের সাহিত্য জগতে মধ্যবিত্তরা তো অবহেলিত চরিত্রই ছিলো, যেন তারা কোনো মানুষই নয়, তাদের কোনো সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা নেই! আর বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের কাছে তো তারা রীতিমতো ভিলেন! হুমায়ূন এসে দেখালেন— মধ্যবিত্তরা যন্ত্র নয়, ভিলেনও নয়; বাংলার কথাশিল্পীদের প্রিয় চরিত্রদের— দরিদ্র মানুষদের— চেয়ে তাদের দুর্দশা এবং সংকটও কম নয়! প্রথা ভেঙে একটি শ্রেণীর দিকে মানবিক চোখে তাকিয়েছিলেন তিনি, মমতা ও সহানুভূতি দিয়ে এঁকেছিলেন তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখকথা। শুধু তাই নয়, তাঁর মধ্যে একজন ভার্সেটাইল লেখক হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও ছিলো। তিনি যখন সায়েন্স ফিকশন লিখেছেন সেগুলোকে নিয়ে গেছেন এক ভিন্নতর উচ্চতায়। সেগুলো শুধু বিজ্ঞান বা ফিকশন থাকেনি, তাঁর হাতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোঁয়ায় হয়ে উঠেছে মানবিক অনুভূতির দলিল। তাঁর রচিত সায়েন্স ফিকশন এই একটি জায়গায় পৃথিবীর অন্য সব সায়েন্স ফিকশন থেকে আলাদা। 'তোমাদের জন্য ভালোবাসা' 'শূন্য' 'নি' ইত্যাদি উপন্যাস সেই প্রমাণ দেবে। আবার মানবমনের গূঢ়-অপার রহস্য নিয়ে তিনি যে মিসির আলী সিরিজ রচনা করেছিলেন, প্রথম দিকে তা-ও ছিলো এক গভীর মানবতাবোধে উজ্জীবিত। শুধু তাই নয়, মনোবিজ্ঞান যে তিনি কতো গভীরভাবে বোঝেন, তার প্রমাণও ধরে রেখেছেন 'যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমির চাঁদ' উপন্যাসে। এটি যে হুমায়ূন আহমেদের রচনা, তা বিশ্বাস করাই কঠিন। সাম্প্রতিককালের 'মনোবৈজ্ঞানিক (!) উপন্যাসের' লেখকরা হুমায়ূনের এই উপন্যাসটি পড়ে শিখে নিতে পারেন, মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস বলতে আসলে কী বোঝায়! এমনকি তাঁর হিমু চরিত্র দিয়ে তিনি প্রথমদিকে খুঁজতে চেয়েছিলেন প্রকৃতির অব্যাখ্যাত রহস্য। জীবন নামক একটি ঘরে যদি দুটো দরজা থাকে, তার একটি দরজা বিজ্ঞান ও যুক্তি ও দর্শন ও ইতিহাস ও মনোবিজ্ঞানের, যেগুলো দিয়ে এই জীবনকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চলছে হাজার হাজার বছর ধরে; আর অন্য দরজাটি এখনো খোলাই হয়নি, সেটি রহস্যময়তায় ভরা, হুমায়ূন সেই দরজাটি খুলতে চেয়েছিলেন হিমুকে দিয়ে। কিন্তু এই কথাগুলো বলা হলো তাঁর প্রথমদিকের রচনা সম্বন্ধে। পরবর্তীকালে জনপ্রিয়তার পিচ্ছিল পথ তাঁকে নিয়ে গেছে পতনের দিকে, তাঁর অপরিণত-অপরিপক্ক টিনএজ পাঠকগোষ্ঠীর মন জুগিয়ে লিখতে গিয়ে করেছেন ক্ষমতার অপব্যবহার। এমনকি হিমুকে তিনি শেষ পর্যন্ত বানিয়ে ফেলেছেন এইসব তরুণদের উদ্ভট আনন্দফূর্তির সঙ্গী। শুধু উপন্যাসেই নয়, গল্পেও তিনি বহুমাত্রিক কাজের সম্ভাবনা দেখিয়েছিলেন। তাঁর রয়েছে নানান ধরনের গল্প লেখার অভিজ্ঞতা— 'অদ্ভুত গল্প' 'ভৌতিক গল্প' 'অতিপ্রাকৃত গল্প' ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে তিনি যে গল্পগুলো লিখেছেন, বাংলাদেশের গল্পসাহিত্যে তা পুরোপুরি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বাংলা সাহিত্য থেকে তো এই ধরনের গল্পগুলো হারিয়েই গিয়েছিল, তিনি সেগুলোকে আবার ফিরিয়ে এনেছেন। 'ছায়াসঙ্গী' 'ভয়' 'পিপড়া' 'সে' 'কুকুর' 'আয়না' ইত্যাদি গল্পের উদাহরণ বাংলা গল্পের দীর্ঘ ইতিহাসে খুব সুলভ নয়। শুধু এগুলোই নয়— মধ্যবিত্ত জীবন নিয়েও তাঁর রয়েছে চমৎকার কিছু গল্প। সত্যি কথা বলতে কি, হুমায়ূনের লেখায়ই আমরা প্রথমবারের মতো মধ্যবিত্তকে পেলাম তাদের নিত্যদিনের সমস্যা-সংকট-আনন্দ-বেদনা-হাসি-কান্না সহ। অবশ্য তাঁর স্বভাবজাত হালকা মেজাজটি সবক্ষেত্রেই পুরোমাত্রায় উপস্থিত, তবু অল্প কথায় জীবনের ছোটখাটো সুখদুঃখগুলো তাঁর গল্পে চমৎকার কুশলতায় ধরা পড়েছে। বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের স্পর্শকাতর বিন্দুগুলো হুমায়ূনের মতো এত ভালো করে আর কেউ চেনেননি। এইখানটায় আমি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মিল খুঁজে পাই। শরৎচন্দ্র যেমন বাঙালি জাতির আবেগপ্রধান স্পর্শকাতর বিন্দুগুলোকে চিনতেন, হুমায়ূন আহমেদ অতোখানি না হলেও বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের হাসি-কান্নার বিন্দুগুলো চেনেন, এবং অনায়াসসাধ্য দক্ষতায় তিনি তাঁর পাঠক-দর্শকদের হাসিয়ে-কাঁদিয়ে চলেছেন। হুমায়ূনের বিপুল গ্রহণযোগ্যতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণও এটি। 'নিশিকাব্য' 'জীবনযাপন' 'খাদক' 'চোখ' 'অচিন বৃক্ষ' প্রভৃতি গল্পে তিনি তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, তিনি তাঁর এই বিপুল জনপ্রিয়তাকে কাজে না লাগিয়ে বরং জনরুচির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। তিনি সবসময়ই বলে এসেছেন— তিনি নিজের আনন্দের জন্য লেখেন। সেটি সব লেখকই লেখেন, কিন্তু তাঁর এখনকার লেখাগুলো পড়লে মনে হয় নিজের আনন্দের জন্য নয়, তিনি লেখেন জনরুচির চাহিদা মেটাতে! ফলে, তাঁর বর্তমানকালের লেখাগুলোতে প্রচুর অমনোযোগিতা চোখে পড়ে, এমনকি, বাক্য গঠন পর্যন্ত শিথিল ও অশুদ্ধ হয়ে ওঠে।

ইমদাদুল হক মিলন ঠিক কতোগুলো জনপ্রিয় উপন্যাস লিখেছেন সেটা হয়তো তিনি নিজেও ঠিক জানেন না। অথচ তারই 'শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলো পড়লে বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করতে হয় যে, তাঁর হওয়ার কথা ছিলো একজন সফল গল্পকার। মিলন ওই 'জনপ্রিয় উপন্যাস'গুলো না লিখে যদি শুধুমাত্র এই গল্পগুলোই লিখতেন, তাঁকে হয়ত মর্যাদা দেয়া হতো একজন প্রধান গল্পকারের। তাঁর গল্পকার পরিচিতিটি তেমন গড়ে ওঠেনি, অথচ তাঁর সমাজ ও জীবন অবলোকনের দৃষ্টিভঙ্গি, নানা ধরনের চরিত্র চিত্রণের দক্ষতা, তাঁর ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি ঈর্ষণীয় সাফল্যের দাবিদার। অর্থাৎ একজন সফল ও গুরুত্বপূর্ণ লেখকের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যই তাঁর করতলগত। গ্রামীণ জীবন নিয়ে তিনি লিখেছেন অসামান্য কিছু গল্প। সত্যি কথা বলতে কি, গ্রামের জীবন মিলনের আগে একমাত্র আবু ইসহাকই এত কুশলতার সঙ্গে তুলে আনতে পেরেছিলেন, আর কেউ নন। 'গাহে অচিন পাখি' তো ইতিমধ্যেই কালজয়ী মাত্রা অর্জন করেছে। 'বদ্যি বুড়োর জীবনকথা' 'নিরন্নের কাল' 'নেতা যে রাতে নিহত হলেন' 'রাজার চিঠি'র মতো অসাধারণ সব গল্পের নির্মাতা তিনি। 'জোয়ারের দিন'-এর মতো অসামান্য প্রতীকী গল্পও খুব বেশি লেখা হয়নি বাংলাদেশে। বেশ কিছু উপন্যাসেও তিনি তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ আঞ্চলিক ভাষায় লেখা তাঁর 'কালাকাল' উপন্যাসের তুলনা কি সহজে পাওয়া যাবে? 'পরাধীনতা' 'যাবজ্জীবন' 'ভূমিপুত্র' উপন্যাসগুলোও তো উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে। যেসব পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি এবং হুমায়ূন আহমেদ রাশি রাশি 'কেচ্ছাকাহিনী' উৎপাদন করেন, সেইসব পাঠকরা কি এই উপন্যাসগুলো পড়েন? পড়েন না, আমি নিশ্চিত। তাঁরাও এটি জানেন। পড়লে 'জোছনা ও জননীর গল্প' পড়ার জন্য হুমায়ূন আর 'নূরজাহান' পড়ার জন্য মিলন বারবার তাঁদের পাঠকদেও কাছে কাতর মিনতি জানাতেন না। যাহোক, প্রতিভার এই অপচয় শুধু যে আমাদের সাহিত্যের ক্ষতি করেছে তাই নয়, ক্ষতি করেছে তাঁদেরও। নিজেদের উৎপাদিত এইসব তুচ্ছ রচনা তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে, এ ব্যাপারে অন্তত আমার কোনো সন্দেহ নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

হুমায়ূন-মিলনের পর বাংলাদেশে জনপ্রিয় সাহিত্যের ধারাটি বিপদজনক এক খাতে প্রবাহিত হতে চলেছে। তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে একমাত্র আনিসুল হক ছাড়া আর কেউই মূলধারার লেখক নন। যে বৈশিষ্ট্য হুমায়ূন-মিলনের মধ্যে দেখা যায়, কাছাকাছি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে আনিসুল হকের মধ্যে। প্রতিভা আছে তাঁরও, সাহিত্যের আলোচনায় তাঁর নামও ঘুরেফিরে আসে, উপেক্ষা করা যায় না। এক 'ফাঁদ' উপন্যাস দিয়েই তিনি চমকে দিয়েছেন সাহিত্যের মূলধারার পাঠকদের। বাংলাদেশের সফল উপন্যাসগুলোর যদি একটা তালিকা করা হয়, তাহলে 'ফাঁদ'কে অবশ্যই রাখতে হবে। এছাড়াও তাঁর চেষ্টা থাকে ভালো কিছু কাজ করবার। সে-সব সফল হয় কী না তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু চেষ্টার কথাটা স্বীকার না করে পারা যাবে না। 'মা' 'আয়েশা মঙ্গল' 'চিয়ারি বা বুদু ওরাঁও কেন দেশত্যাগ করেছিল' প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি আমাদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো নিয়ে কাজ করেছেন। শিল্পমূল্যের বিচারে এসব উপন্যাস হয়তো খুব বেশি মার্কস পাবে না সমালোচকদের কাছ থেকে, কিন্তু তাঁর কমিটমেন্টটাকে উপেক্ষাও করা যাবে না। এসব উপন্যাসের মূল সমস্যা, আনিসুল হক তাঁর স্বতস্ফূর্ততা হারিয়েছেন (একই সমস্যা হুমায়ূনের 'জোছনা ও জননী গল্প' এবং মিলনের 'নূরজাহান' উপন্যাসে ঘটেছে। তাঁদের গদ্যের যে মূল শক্তি, স্বতস্ফূর্ততা— সেটার মারাত্মক অভাব চোখে পড়ে এসব রচনায়।) যা হোক, আনিসুল হকের শক্তিমত্তা নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু জনপ্রিয়তা চর্চার ক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের সঙ্গে তার কিছু মৌলিক পার্থক্য চোখে পড়ে। সত্যি কথা বলতে কি, হুমায়ূন আহমেদকে কখনোই 'জনপ্রিয়' হবার জন্য কাঙাল হতে দেখিনি, মিলনের মধ্যে ব্যাপারটা একটু থাকলেও আনিসুল হকের মধ্যে সেই কাঙালপনা বড়ো দৃষ্টিকটুভাবে চোখে পড়ে, এবং এজন্য মিডিয়াকে যথেচ্ছ এবং সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে ছাড়েন না তিনি। প্রিন্ট মিডিয়ায় নিজের নামে বিজ্ঞাপন দেয়া এবং নিজের লেখা নাটক-সিনেমার অস্বাভাবিক প্রচার-প্রচারণার ব্যাপার তো আছেই, টেলিভিশনের এহেন কোনো অনুষ্ঠান নেই যেখানে ডাকলে তিনি যান না! আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, তাঁর মতো একজন লেখককে কেন রান্নাবান্নার অনুষ্ঠানে যেতে হবে! লেখকরা টেলিভিশনে যেতেই পারবেন না, আমি তা বলছি না। বলছি রুচির কথা। আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন কোনো লেখকের তো টেলিভিশনে অতো দৌড়াদৌড়ি করার কথা নয়! বিশেষ করে তুচ্ছ অনুষ্ঠানগুলোতে লেখকদের উপস্থিতি চোখের জন্য খুবই পীড়াদায়ক। একজন লেখককে তার পাঠকরা তো মাথায় করে রাখেন, টিভিতে সেই লেখককে আলুভর্তার রেসিপি দিতে দেখলে, বা রান্নাবান্না প্রতিযোগিতার বিচারক হতে দেখলে পাঠক হিসেবে নিজেকে ছোট মনে হয়! আনিস প্রচুর নাটক লেখেন, এবং আমি তাতে আপত্তিও করি না। নাটক রচনা করা আর নিজেকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ অনুষ্ঠানে হাজির করা এক কথা নয়! এইসব তিনি করেন কেন? আমার ধারণা, করার কারণ— তাঁর 'জনপ্রিয়' রচনার সম্ভাব্য পাঠকরা ওই রান্নাবান্না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুষ্ঠানের দর্শক! অতএব এই দর্শক-পাঠকদের কাছে নিজেকে আরো খানিকটা পরিচিত করে তুলতে মেকাপ মেখে হাজির হতেও দ্বিধা নেই তাঁর। আমি এটাকেই বলছি কাঙালপনা। জনপ্রিয়তার জন্য হুমায়ূন আহমেদকে তো এইসব করতে হয়নি, লেখা ছাড়া জনপ্রিয় হবার অন্য কোনো কৌশল তিনি ব্যবহারই করেননি, তাহলে আনিসকে কেন করতে হয়? অবশ্য মিলনও টেলিভিশনমুখী এবং যে-কোনো ধরনের অনুষ্ঠানেই তাকে দেখা যায়। তবে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, মিলনের যেহেতু সুনির্দিষ্ট পেশা নেই আনিসের মতো, টেলিভিশনও তাঁর উপার্জনের একটা ক্ষেত্র। যা হোক, বাংলাদেশের জনপ্রিয় সাহিত্যের বিকাশে টেলিভিশনের ভূমিকা আছে। এ বিষয়ে একটু পরই কথা বলবো আমরা। আনিসও তার সুফলভোগী।

একজনের কথা আমি এ পর্যন্ত বলিনি, যদিও তিনি তুমুল জনপ্রিয়, তবে তাঁর বিষয়টি ঠিক জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে মাপা যাবে না। তিনি মুহম্মদ জাফর ইকবাল। এই লেখক জনপ্রিয় হয়েছেন প্রধানত তাঁর কিশোর রচনা ও সায়েন্স ফিকশনের কারণে। শিশু-কিশোররা তাঁকে প্রায় দেবতার আসনে বসিয়েছে। যে-কোনো জায়গায় তাঁর উপস্থিতিতে শিশু-কিশোরদের মধ্যে যে আলোড়ন পড়ে, তাঁকে ঘিরে এই দেবদূতদের যে মেলা বসে, তার মতো নয়নাভিরাম দৃশ্য খুব কমই হওয়া সম্ভব। জনপ্রিয় হওয়ার জন্য তাঁকে অদ্ভুত-উদ্ভট কার্যকলাপ করতে হয়নি, লেখাই তাঁর একমাত্র সম্পদ। বরং নানারকম সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ তাঁকে একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এখানে এসেই শিল্প ও শিল্পীর জনপ্রিয়তার প্রসঙ্গটি আবার উত্থাপন করা যায়। মুহম্মদ জাফর ইকবাল তাঁর লেখাগুলোর কারণে যেমন তাঁর পাঠকদের কাছে অস্বাভাবিকরকমের জনপ্রিয়, তেমনি তাঁর ব্যক্তি-ইমেজের কারণে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে রয়েছে তাঁর অভাবিত গ্রহণযোগ্যতা। এই যুগপৎ জনপ্রিয়তা/গ্রহণযোগ্যতা আমাদের অন্য কোনো জনপ্রিয় লেখকের নেই।

৫

এবার আনিস-পরবর্তী জনপ্রিয়দের নিয়ে দু-চার কথা বলা দরকার। আমার মনে হয়, আনিস-পরবর্তী প্রজন্মের 'জনপ্রিয়' লেখকগণ কোনো-কোনো ব্যাপারে আনিসের উত্তরসূরি। মেধা-প্রতিভার দিক থেকে অবশ্য তারা আনিসের কেশাগ্রের সমানও নয়, তবে প্রচার-প্রচারণার ধরন-ধারণ, জনপ্রিয় হবার জন্য কাঙালপনা— এসবই যেন আনিসের কাছ থেকে পাওয়া। অর্থাৎ এরা সবাই জনপ্রিয় হবার জন্য দৃষ্টিকটু সব কাজকর্ম করেন। তবে পূর্বসূরিদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য হলো এই যে, পূর্বসূরিরা মূলধারা থেকেই জনপ্রিয় হয়েছেন, আর এই তরুণরা জনপ্রিয় হবার জন্যই লেখালেখি শুরু করেছেন এবং চালিয়ে যাচ্ছেন। মূলধারায় না থাকার কারণেই সারাবছর ধরে সাহিত্যজগতে এদের কোনো উপস্থিতি চোখে পড়ে না, পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না তারা, সাহিত্যের আলোচনায় তাদের নামটি ভুলক্রমেও উচ্চারিত হতে দেখা যায় না, নিজেরাও কোনো সাহিত্যিক আড্ডায় বা সভায় বা অনুষ্ঠানে শরিক হন না, লেখকদের যে আলাদা একটা কমিউনিটি আছে তারা বোধহয় সেটা জানেনও না; অথচ ফেব্রুয়ারির বইমেলার সময় এদের হম্বিতম্বিতে মনে হয়— এরাই সাহিত্যের একমাত্র প্রতিনিধি— অন্য কোনো লেখকও নেই, অন্য কোনো লেখাও নেই (এটি তারা সত্যি সত্যিই মনে করেন, একটু পরেই সেই উদাহরণ দেবো আমি)। মজার ব্যাপার হলো— মূলধারার পত্রপত্রিকা বা ছোটকাগজগুলো কিন্তু তাদের নিয়ে কথা বলে না, নিজেদেরকে নিয়ে তারা নিজেরাই মাতামতি করেন। এটি তথাকথিত 'জনপ্রিয় সাহিত্যের' নতুন একটি ধারা। এই ধারার অগ্রজ লেখক হলেন প্রণব ভট্ট। তবে প্রণবের আগেও এই ধরনের আরেকজন লেখক ছিলেন, যিনি কাজেকর্মে অনেকটা একইরকম হলেও বিশেষ জনপ্রিয়তা পাননি। তিনি আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন। এই লেখক পুলিশের উচ্চপদস্থ এবং অতি ক্ষমতাবান কর্মকর্তা ছিলেন। তার সময়ে দেশে খুব কম সংখ্যক ঈদসংখ্যা বেরুতো, কিন্তু এমন একটি ঈদসংখ্যাও ছিলো না যেখানে এই লেখকের একটা উপন্যাস না থাকতো! সেইসব উপন্যাস নিতান্তই অখাদ্য রচনা, দু-পাতার বেশি পড়া যেত না, অথচ বৈধ-অবৈধ উপায়ে নানারকম চাপ প্রয়োগ করে তিনি সাহিত্য জগতে টিকে ছিলেন। বিস্মৃত হতেও সময় লাগেনি। প্রণব ভট্ট এক অর্থে আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীনের উত্তরসূরি। তিনি অবশ্য মানুষ হিসেবে ভালো ছিলেন, কিন্তু তার কোনো পুস্তকই তিন পৃষ্ঠার বেশি পড়া যায় না! এইরকম বীভৎস লেখা কোন শ্রেণীর পাঠকরা পড়েন খোদা মালুম! লেখালেখির মানের কথা যদি বলি, তাহলে আজকালকার জনপ্রিয় লেখকরা প্রণব ভট্টের উত্তরসূরি। যেহেতু লেখালেখিতে তাদের মেধা শূন্যের কোঠায়, ফলে জনপ্রিয় হবার জন্য তাদেরকে নানা কৌশল করতে হয়। বইমেলার সময় বহুলপ্রচারিত দৈনিকে দিনের পর দিন ধরে নিজের টাকায় রঙচঙে বিজ্ঞাপন দিতে হয়, প্রথম মুদ্রণ ছাপা হবার সময়ই দ্বিতীয়/তৃতীয় মুদ্রণ ছাপা হয়ে যায়, এবং নিয়মমাফিক প্রতি সপ্তাহের বিজ্ঞাপনের ভাষা পরিবর্তিত হয়ে যায়— প্রথম মুদ্রণ শেষ, তৃতীয় মুদ্রণ শেষের পথে ইত্যাদি। অবশ্য পাঠকদের মনে এ প্রশ্ন জাগতেই পারে— তারা যে নিজেদের টাকায় বিজ্ঞাপন দেন, তার প্রমাণ কী? প্রকাশকরাও তো দিয়ে থাকতে পারেন! প্রমাণের জন্য আপনার কমনসেন্সই যথেষ্ট, প্রিয় পাঠক। ধরা যাক, একজন 'জনপ্রিয়' লেখকের পাঁচটি বই পাঁচ প্রকাশনা সংস্থা থেকে বেরিয়েছে। এই পাঁচজন প্রকাশক কী একত্রিত হয়ে ওই লেখকের পাঁচটি বইয়ের বিজ্ঞাপন একটিমাত্র বক্সের মধ্যে সেঁটে দেবেন? প্রশ্নই ওঠে না। প্রকাশকরা বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে শুধুমাত্র নিজেদের প্রকাশিত বইটির বিজ্ঞাপন দিতে পারেন। সেটি তারা দেনও। হুমায়ূন বা মিলনের বা আরো অনেক লেখকের শুধুমাত্র নিজের প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত বইটির বিজ্ঞাপনও দিয়ে থাকেন কোনো-কোনো প্রকাশক। সেটি খুবই গ্রহণযোগ্য। প্রকাশক তো ব্যবসা করতে এসেছেন, 'বই' তার কাছে পণ্যই, নিজের পণ্যের কথা তিনি সম্ভাব্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রেতাকে জানাবেন সেটি তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু লেখক নিজেও কী নিজের বইটিকে 'পণ্য' মনে করেন? নইলে একই কাণ্ড তিনি করেন কীভাবে? শুধু তাই নয়, মেলাপ্রাঙ্গণে তাদের দৌড়ঝাঁপ একটা দেখার মতো দৃশ্য হয়ে দাঁড়ায়! এক প্রকাশনীর স্টল থেকে অন্য স্টলে ছুটে বেড়ান তারা, নিজেই সেলসম্যানের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে পড়েন, ক্রেতা এলে নিজে থেকে নিজের বইটি এগিয়ে দেন, কখনো বা ক্রেতা একটা বই নিজে থেকে তুলে নিলে এরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজের আরেকটা বই তার হাতে তুলে দিয়ে সেটিতে কি আছে তার বর্ণনা দেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। 'আত্মমর্যাদা' শব্দটির সঙ্গে এদের পরিচয়ই নেই। নূন্যতম আত্মমর্যাদাবোধ থাকলে কোনো লেখকের পক্ষে এরকম নির্লজ্জ আচরণ করা সম্ভবই নয়! এরা কেউই মূলধারার লেখক নন, এদের লেখায় সাহিত্যমূল্য বলতে কোনো ব্যাপারও নেই, অথচ এদের আত্মম্ভরিতা সীমাহীন। মাসকয়েক আগে টেলিভিশনে এই প্রজন্মের একজন তরুণ 'জনপ্রিয়'র সাক্ষাৎকার 'অবলোকনের' মহাসৌভাগ্য হয়েছিলো। স্মার্ট উপস্থাপিকা তাকে— 'আপনার ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা কী?' জিজ্ঞেস করার পর তার উত্তর ছিলো এরকম— আমি সারাদেশ থেকে 'মেধাবী' লেখক 'হান্ট' করবো। আপনারা (মানে, টেলিভিশনওয়ালারা) যেমন বিভিন্ন বিষয়ে ট্যালেন্ট হান্ট করেন, আমার কাজটিও সেইধরনের হবে। 'কেন?' কারণ, বাংলাদেশে মাত্র চার/পাঁচজন লেখক আছেন, বইমেলার সময় 'বই' লেখার জন্য আর কোনো লেখকই পাওয়া যায় না, এই চার/পাঁচজন ছাড়া আর কারো বই বিক্রিও হয় না। এই অভাব পূরণ করার জন্যই আমি লেখক হান্ট করতে চাই।' আহা, কী মহৎ ইচ্ছা! চার/পাঁচজন ছাড়া নাকি দেশে কোনো লেখকই নেই! বলাবাহুল্য, তিনি লেখক বলতে ওই জনপ্রিয়দেরই বুঝিয়েছেন, যাদের বই 'বিক্রি' হয়! তবে এই কথাগুলো বলার সময় কাশেম বিন আবু বকরের কথা ওই 'জনপ্রিয়' সাহেবের মনে ছিলো কী না, জানা হয়নি। প্রিয় পাঠক, আমি নিশ্চিত, এই নামটি শুনে আপনারাও চমকে উঠেছেন। নামটি কখনো শুনেছেন বলেও আপনার মনে পড়ছে না। তাহলে, শুনুন। বাংলাবাজারের বইয়ের বাজার সম্বন্ধে যাদের একটু-আধটু ধারণা আছে, তারা জানেন— বাংলাদেশে বই বিক্রির শীর্ষে আছেন যে লেখক, তার নাম হুমায়ূন আহমেদ নয়, কাশেম বিন আবু বকর! এ কথা প্রকাশকরাও স্বীকার করেন। তাহলে আমরা তাঁর নাম জানি না কেন? কারণ তিনি মূলধারার লেখক নন, তাকে নিয়ে কখনো আলোচনা হয় না পত্রপত্রিকায়, রেডিও-টেলিভিশনে। নিজেকে রঙচঙে বিজ্ঞাপনে রঞ্জিত করে হাজির করার পদ্ধতিও তার অজানা, অথবা জেনেও তিনি এর প্রয়োজন বোধ করেন না! এদিক থেকে দেখতে গেলে বলতে হয়, তরুণতর জনপ্রিয়রা কাশেমের চেয়েও অযোগ্য লেখক। কারণ তিনি বাংলাদেশের সর্বাধিক বিক্রিত লেখক, আর রঙ মেখেও কুলোয় না বলে এই তরুণদেরকে বইমেলায় নিরন্তর ছুটোছুটি করতে হয় নিজের দু-একটা বই সম্ভাব্য ক্রেতার হাতে পৌঁছে দেবার জন্য!

বইবিক্রির পরিমাণ দিয়ে জনপ্রিয়তার ব্যাপারটা ঠিকভাবে বোঝা যায় না, আবার 'জনপ্রিয়তা' লেখক হিসেবে শক্তিমত্তার পরিচয়ও বহন করে না। করলে, বলতেই হবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাশেম বিন আবু বকরই এদেশের সবচেয়ে শক্তিমান লেখক! এ কথা নিশ্চয়ই তরুণ জনপ্রিয়রাও স্বীকার করবেন না, এমনকি মহামূর্খ হলেও আবছাভাবে দু-চারজন শক্তিমান লেখকের কথা মনে পড়ে যাবে তাদের!

৬

বাংলাদেশে জনপ্রিয় সাহিত্যের বিকাশে টেলিভিশনের একটা বড়োসড়ো ভূমিকা আছে! আগেই বলেছি, গত শতকের আশির দশকের মাঝামাঝিতে এসে প্রধানত হুমায়ূন আহমেদের কল্যাণে এবং দ্বিতীয়ত মিলনের টিন-এজ ক্রেজের কারণে জনপ্রিয় সাহিত্যের বিকাশ শুরু হয়। তাঁদের আগেও যে সাহিত্যে জনপ্রিয় উপাদান ছিলো না, তা নয়। রোমেনা আফাজ বা আকবর হোসেনের মতো মূলধারার বাইরের লেখকদের কথা বাদ দিলেও, আরো কেউ কেউ ছিলেন যাদের লেখা জনপ্রিয় হতে পারতো। এঁদের মধ্যে রাহাত খানের নাম সর্বপ্রথম নিতে হবে। প্রাঞ্জল-কমিউনিকেটিভ ভাষা, চমৎকার বিষয়, উইট, হিউমার সবই ছিলো তাঁর লেখায়। সৈয়দ হকের কিছু লেখাও জনপ্রিয় উপাদানে ভরপুর ছিলো। কিন্তু তাঁদের সময়ে জনপ্রিয় সাহিত্যের বিকাশ ঘটেনি কেন? আশির দশকেই বা এমনটি হলো কেন? হুমায়ূন বা মিলন দুজনেই লিখতে শুরু করেছিলেন সত্তর দশকে, শুরু থেকেই কেন তাঁরা জনপ্রিয়তা পাননি? এর উত্তর পাওয়া যাবে টেলিভিশনের নাট্যইতিহাসের দিকে তাকালে। আশির গোড়াতে হুমায়ূনের 'এইসব দিনরাত্রি' সারাদেশব্যাপি বিপুল সংখ্যক দর্শকদের কাছে সমাদৃত ও অভিনন্দিত হয়। এবং এর পরপরই হুমায়ূনের বইয়ের বিক্রি বাড়তে শুরু করে। বোঝা যায়, টেলিনাটকের কিছু দর্শক শুধুমাত্র হুমায়ূনের নাটক দেখে সন্তুষ্ট থাকতে পারছিলেন না, তারা তাদের প্রিয় নাট্যকারের উপন্যাসও পড়তে চাইছিলেন। এই দর্শকদের একাংশই হুমায়ূনের পাঠকে পরিণত হয়েছেন, এবং তাদের মাধ্যমে হুমায়ূনের আরো নতুন নতুন পাঠক তৈরি হয়েছে। শুধু 'এইসব দিনরাত্রি' নয়, প্রায় একদশক ধরে হুমায়ূন ছিলেন টেলিভিশনের ধারাবাহিক নাটকের রাজলেখক। হুমায়ূন মানেই হিট, হুমায়ূনের নাটক মানেই রাস্তাঘাট খালি হয়ে যাওয়া, টেলিভিশনের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়া পেশা-বয়স নির্বিশেষে সব ধরনের দর্শকদের ক্লান্তিহীন উপভোগ! 'কোথাও কেউ নেই' 'বহুব্রিহী' 'অয়োময়' 'আজ রবিবার' ইত্যাদি ধারাবাহিকের কথা এখনো দর্শকরা ভোলেননি। সঙ্গে একক নাটক তো ছিলোই। তখন বিটিভিই ছিলো একমাত্র টেলিভিশন চ্যানেল, হুমায়ূনকে তাই তেমন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও পড়তে হয়নি। কিন্তু নাটকেই বা হুমায়ূন এমন বাজিমাত করলেন কীভাবে? তখন কী নাট্যকার-নাটক সংকটে ভুগছিলো টেলিভিশন বা দর্শকরা? না, তা নয়। বরং ওই সময়টিই ছিলো বাংলা টেলিনাটকের স্বর্ণযুগ। আতিকুল হক চৌধুরী, মমতাজউদ্দিন আহমদ, আব্দুল্লাহ আল মামুন, মামুনুর রশীদ, সেলিম আল দীন এবং আরো পরে এসে ইমদাদুল হক মিলন ও আখতার ফেরদৌস রানা— টেলিনাটকে একেকটা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো নাম। তবু হুমায়ূন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিভাবে সব এমন দখল করে নিলেন? তার কারণ ওই 'এইসব দিনরাত্রি'। টেলিভিশনের মধ্যবিত্ত দর্শকরা নিজেদেরকে দেখতে পেলেন এই নাটকে; দেখলেন নিজেদের সুখদুঃখ-আনন্দবেদনা-হাসিকান্না-ঠাট্টাদুষ্টুমি-আবেগঅভিমান এবং সর্বোপরী আকাঙ্ক্ষার চিত্র। উল্লেখ্য যে, তখন পর্যন্ত বাংলাদেশে টেলিভিশন ব্যাপারটা আজকের মতো এত সহজলভ্য হয়ে ওঠেনি। ঘরে ঘরে টেলিভিশন পৌঁছেনি, নিম্নবিত্ত তো দূরের কথা, অনেক মধ্যবিত্তের ঘরেও তখন টেলিভিশন ছিলো না। মফস্বলে কিছু ঘরে থাকলেও গ্রামে ব্যক্তিগত সংগ্রহে টেলিভিশনের সংখ্যা ছিলো খুবই কম, বাজারে বা ইউনিয়ন পরিষদে রাখা একমাত্র টেলিভিশন দেখার জন্য লোকজন জড়ো হতো; ফলে, তখন পর্যন্ত টেলিভিশনের নিয়মিত দর্শক ছিলো মূলত শহুরে মধ্যবিত্তই। এই দর্শকরাই 'এইসব দিনরাত্রি'র মাধ্যমে হুমায়ূনের সঙ্গে প্রথমবারের মতো পরিচিত হয়েছিলেন। সত্যি বলতে কি, 'পারিবারিক কাহিনী' বলতে যা বোঝায় 'এইসব দিনরাত্রি' ছিলো তারই প্রথম স্বার্থক রূপায়ন, পারিবারিক বিনোদন বলতে যা বোঝায় সেটাও এই প্রথমবারের মতো উপভোগ করলো টেলিনাটকের দর্শককূল। এদের একটি বড়ো অংশ যেহেতু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত দর্শক, তারা যে এই নাট্যকারের বই পড়ে দেখতে চাইবেন, তা আর অস্বাভাবিক কী? এই পাঠকরা হয়তো সাহিত্যের মূলধারার কোনো খবরই রাখতেন না, হুমায়ূন ছাড়া যে আর কোনো লেখক আছেন দেশে, সাহিত্য বলে যে একটা বিষয় নিয়ে কিছু লোক মাতামাতি করেন, তা-ও হয়তো তাদের অজানাই ছিলো। এই নতুন পাঠকগোষ্ঠী, যারা প্রধানত টেলিনাটকের দর্শক, যখন হুমায়ূনের বই কেনা শুরু করলেন তখন একটা অভাবিত ঘটনা ঘটলো। বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাস নতুন একটা বাঁক নিলো, পণ্য হিসেবে 'বই' নামক অত্যন্ত 'স্লো আইটেম' (এবং প্রায়শই অলাভজনক) দ্রুতই একটা লাভজনক পণ্যে পরিণত হলো। হুমায়ূন কিন্তু থামলেন না, ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের নাটক উপহার দিয়েই চললেন। 'বহুব্রিহী' এবং 'আজ রবিবার'-এ ব্যাপক হিউমার উপহার দিলেন, 'অয়োময়'-এ ইতিহাসের এক অনালোকিত অধ্যায়কে টেলিভিশনের পর্দায় হাজির করলেন, 'কোথাও কেউ নেই'-এ শহুরে জীবনের হাসিকান্নামাখা কাহিনীচিত্র নিয়ে এলেন। ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার এই কাজগুলো তাঁকে দর্শকদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তুললো। তবে, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো— হুমায়ূন যে শুধু নাটক নিয়েই পড়ে রইলেন তা নয়, লেখালেখিও চালিয়ে গেলেন পূর্ণ মাত্রায়। শুধু মধ্যবিত্তের হাসিকান্নার ইতিহাসই লিখলেন না, নিয়ে এলেন মিসির আলী এবং হিমু নামক দুটো অভাবনীয় চরিত্র, লিখলেন চমৎকার সব সায়েন্স ফিকশনও। ফলে তাঁর পাঠকরা সর্বদাই একটা নতুনত্বের স্বাদ পেতে থাকলেন তাঁর কাছে। তাঁর জনপ্রিয়তা উত্তোরত্তর বেড়েই চললো, তৈরি হলো নতুন নতুন পাঠক, আর সেইসব পাঠকদের সর্বগ্রাসী চাহিদা পূরণের জন্য অনিবার্যভাবেই তাঁকে যোগান দিয়ে যেতে হলো নানা ধরনের কল্পকাহিনী। একজন মানুষের ভাণ্ডারে কতোটুকুই বা জমা থাকে? সব উজার করে দিতে গেলে 'ভালো' জিনিস ফুরিয়ে গিয়ে একসময় উচ্ছিষ্টটুকু বেরিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসে, তাঁর ক্ষেত্রেও তেমনটিই ঘটতে লাগলো। একসময় 'নিজের আনন্দের জন্য' যে 'শিল্পী' তাঁর 'শিল্প' রচনা করতেন, তিনিই ঘটনাচক্রে জনরুচির কাছে আত্মসমর্পণ করার লোভ সামলাতে পারলেন না। এক কথায়, তাঁর পতন ঘটলো। এক হিমুকে নিয়ে বাড়াবাড়ির ঘটনা থেকেই ব্যাপারটা টের পাওয়া যায়! (বইমেলায় একদল অর্ধউন্মাদ তরুণের হলুদ পাঞ্জাবি পরে ছুটোছুটি করা, হিমুর বিয়ে নামক বিচ্ছিরি একটা ব্যাপারের আয়োজন করা— প্রকাশকের এইসব কর্মকাণ্ডকে তাঁর মতো একজন মানুষ কিভাবে অনুমোদন করেন, ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়!) শুধু লেখালেখিতেই নয়, টেলিনাটকেও তিনি সচল আছেন, তবে আগের সেই আনন্দ-বিনোদন খুঁজে পাওয়া যাবে না তাঁর নাটকে, পাওয়া যাবে নিছক ভাঁড়ামি। এ হচ্ছে জনরুচির কাছে আত্মসমর্পণের ফল।

ইমদাদুল হক মিলনও টেলিভিশনে খুব দর্শকনন্দিত নাটক লিখেছেন। নব্বই দশকের শুরুর দিকে 'যতো দূরে যাই'–এর কথা মনে পড়ছে আমার, এই মুহূর্তে। এরকম অসংখ্য খণ্ড নাটক, ধারাবাহিক নাটক (যেমন, 'বারো রকমের মানুষ'), একঘণ্টার নাটক আছে তাঁর, যেগুলো দর্শকরা লুফে নিয়েছিলেন। তবু, আমি বলবো, তাঁর জনপ্রিয়তার ধরনটি হুমায়ূন থেকে আলাদা। মিলনের দর্শক-পাঠকরা প্রধানত টিনএজার। শুরু থেকেই তিনি এদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বইটিও তখনকার টিনএজারদের কাছে প্রিয় ছিলো। কিন্তু, টিনএজাররা যেহেতু চিরকাল টিনএজার থাকে না, তাদের বয়স বাড়ে, বুদ্ধি বাড়ে, আবেগের ধরন বদলায়, অতএব তাদের একসময়ের প্রিয় 'এইসব' লেখাকে একসময় বালখিল্যসুলভ মনে হয়। এই পাঠকদের মধ্যে যারা বোধবুদ্ধি ও অনুভূতির তীব্রতা দিয়ে জীবন ও জগতের জটিল রহস্যময়তার অস্তিত্ব অনুভব করে উঠতে পারেন, তারা মিলনের ভালো লেখাগুলো খুঁজে নেন। আর যারা তা পারেন না, যারা একটা অনতিক্রম্য গণ্ডির মধ্যেই জীবন কাটিয়ে দেন, যাদের মানসিক বিকাশের হার প্রায় একটা জড় পদার্থের মতোই, যদিও সময়ের নিয়মে তাদের বয়স বেড়েছে, তাদের কাছে মিলনের উন্নত শিল্পরুচিসম্পন্ন লেখাগুলোকে কঠিন মনে হয়! হুমায়ূনের প্রায় সব লেখাই যেমন সব বয়সী পাঠকদের কাছে 'মজাদার' ও 'আরামদায়ক', মিলনের লেখাগুলো তা নয়! বরং তাঁর উন্নত লেখাগুলো জীবনের এক জটিল দিক উন্মোচন করে পাঠককে দেখায়, পাঠক ভাবতে বাধ্য হন, তার 'আরাম' নষ্ট হয়ে যায়! জড়বুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকরা তাই মিলনের কাছ থেকে দূরে সরে যান দুটো কারণে— বয়স বেড়ে যাওয়ার কারণে টিনএজারদের জন্য লেখা কেচ্ছাকাহিনীগুলো ভালো লাগে না, আবার ভালো লেখাগুলো তারা বুঝতে পারেন না বা পারলেও যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়! মিলন এভাবেই তাঁর পুরনো পাঠক হারান, কিন্তু হুমায়ূন কখনোই হারান না।

সময় পাল্টায়, নতুন সময়ের টিনএজারদের জীবনযাপন, চিন্তাভাবনা, মূল্যবোধ, ঔচিত্যবোধ, নৈতিকতার বোধ— সবই পুরনো সময়ের টিনএজারদের চেয়ে বদলে যায়। বয়স বেড়ে যাওয়া মানুষগুলো নতুন সময়ের এই টিনএজারদের চিনতে পারেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, বুঝতেও পারেন না। আর তাই বয়স্ক মানুষদের মুখে প্রায়ই এই আক্ষেপ-অভিযোগ শোনা যায়— 'তোদের বয়সে তো আমরা এমন ছিলাম না!' থাকবেন কীভাবে? সময় পাল্টে গেছে যে! বয়সটা একই হলে কি হবে, সময়ের কারণেই এই তরুণদের জীবনে যে নতুন নতুন বিষয় যুক্ত হয়েছে, আপনাদের জীবনে তো তা ছিলোই না! আপনার তারুণ্যের সময় সেলফোন নামক কোনো বস্তু ছিলো না, যে, সময়ে-অসময়ে প্রিয় বন্ধু/বান্ধবীকে কল/মিসকল/এসএমএস দিয়ে নিজের অস্তিত্বের জানান দেবেন, ছিলো না ইন্টারনেট নামক যোগাযোগ মাধ্যমটিও যে চিঠির বদলে ইমেইল করবেন, চ্যাট করবেন ইত্যাদি। এগুলো দু-একটি উদাহরণ, একটু ভালো করে আপনার চারপাশে চোখ বুলালেই আপনি দেখতে পাবেন— কতো কতো পরিবর্তন ঘটে গেছে চারপাশে! তরুণরা এই পরিবর্তনের গর্বিত অংশীদার, আপনার সেটা ভালো লাগুক আর না লাগুক, তারা তা উপভোগ করবে। সেক্ষেত্রে যে বইটি আপনার কৈশোরে বা সদ্য তারুণ্যে আপনার বুকে হাহাকার তুলেছিল, চোখ ভিজিয়ে তুলেছিল, তা যে আজকের তরুণদেরও মনে ঝড় তুলবে এমন কোনো নিশ্চয়তা তো নেই! আর তাই, একসময়ের টিনএজারদের কাছে তুমুল জনপ্রিয় একটি লেখা সময়ের ফাঁদে পড়ে অজনপ্রিয় হয়ে যেতে পারে। নতুন সময়ের টিনএজারদের মন জয় যদি করতেই হয়, তাহলে এদের মনটা বুঝতে হবে, সময়টিকে বুঝতে হবে, এদের জীবনযাপন ও মূল্যবোধের ধরনটি বুঝতে হবে। পুরনো সময়ের লেখকরা কী তা পারবেন? মনে হয় না! তারা তো এই জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে যান না! মিলনের জনপ্রিয়তার ক্রমাবনতির এই হলো কারণ। কিন্তু তিনি জনপ্রিয়তার হ্রাসের এই ব্যাপারটা বোধহয় মানতে পারেন না, ফলে নানাভাবে চেষ্টা করে যান নব্য তরুণদের মন জয়ের, সেটা আর হয়ে ওঠে না, বরং সেগুলো সাক্ষর হয়ে থাকে শিল্পী হিসেবে তাঁর পতনের। সেই একই ব্যাপার— জনরুচির কাছে আত্মসমর্পণ!

৭

সত্যি কথা বলতে কি, শিল্পসাহিত্য বিষয়টি কখনোই জনগনের জিনিস নয়। সূক্ষ্ম ও উন্নতরুচির মানুষই শিল্পের ভোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক। এবং একটা বিষয় খেয়াল করলে দেখা যাবে— শিল্প যতো বেশি মূর্ত ততো বেশি ভোক্তা, বিমূর্ত শিল্পের ভোক্তা কম, এবং খানিকটা জনবিচ্ছিন্নও বলা যায়! চলচ্চিত্র-নাটক ইত্যাদির ভোক্তা সবচেয়ে বেশি, কারণ এগুলো সরাসরি মূর্ত শিল্পমাধ্যম, ভিজুয়াল মিডিয়া। বিমূর্ত চলচ্চিত্রও হতে পারে ('দেখে কিছুই বোঝা গেলো না' ধরনের), তবে তা কখনো 'জনপ্রিয়' হয় না। কবিতা-গল্পের চেয়ে উপন্যাসের পাঠক বেশি। কারণ ওই একটাই। উপন্যাস যেভাবে ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে এগোয় সেটা পাঠকের সামনে কাহিনীকে মূর্ত করে তুলতে সহায়তা করে এবং ভোক্তার মনের ওপর চাপ কম পড়ে, কবিতা তা করে না। গল্প করে, তবে কম মাত্রায়। চিত্রকলার ভোক্তা আরো কম। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাণী-সুর সমৃদ্ধ গানগুলো ধ্রুপদী সঙ্গীতের চেয়ে জনপ্রিয় হয়ে থাকে। এই যে জন-গ্রহণযোগ্যতার ধারাক্রম, এটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখে নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না যে, পপ সঙ্গীতের চেয়ে ধ্রুপদী সঙ্গীত কম শিল্পমান-সম্পন্ন, কারণ তার ভোক্তা কম; বা কবিতা শিল্পমাধ্যমটি উপন্যাসের চেয়ে দুর্বল কারণ তার পাঠক কম! বরং উল্টোটাই বলবেন। আসলে জনরুচি দিয়ে শিল্পবিচার হয় না। সত্যি কথা বলতে কি জনরুচি-শিল্পরুচি একসঙ্গে যায়ই না। জনরুচি সবসময়ই চটুলতার পক্ষে থাকে, কখনোই তা শিল্পাভিমুখী নয়। আর এই চটুল জনরুচির দায় মেটাতে গিয়ে নিজের শিল্পরুচির কথা বিস্মৃত হন জনপ্রিয়রা। তাদের শিল্পীজীবনের এটিই সবচেয়ে ট্র্যাজিক পরিণতি। জনপ্রিয় লেখকেরা ক্রমাগত সেই অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছেন, ব্যাপারটা কী তারা জানেন?

[রচনাকাল : জুন ২০০৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমালোচনা, সমালোচক ও পাঠক

'কিচ্ছু হয়নি'— দু-শব্দের এই ভয়াবহ বাক্যটি আমাদের সাহিত্য-জগতে অহরহ শুনতে পাওয়া যায়! পনের কোটি মানুষের এই দেশে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত মানুষের সংখ্যা হয়তো পনের শ'র বেশি হবে না, কিন্তু এই বিপদজনক সংখ্যালঘুত্ব নিয়েও তারা পরস্পরকে স্বীকার করার চেয়ে অস্বীকার করতেই ব্যস্ত থাকেন বেশি, আর এই অস্বীকার তাদেরকে অধিকতর সংখ্যালঘুতে পরিণত করে! ব্যাপারটা এরকম— কিছু লোক উপন্যাস লিখে চলেছেন, তাদেরই সহযাত্রী কিছু লোক বলছেন— ওগুলো উপন্যাস হয়নি! গল্পের অবস্থা আরও করুণ। কার গল্প যে হচ্ছে সেটা বুঝে ওঠাই কঠিন। সবচেয়ে জটিল অবস্থা কবিতার। যে-কোনো সাহিত্য আড্ডায় বসলেই শোনা যায়— ওই আড্ডার দু-চারজন ছাড়া আর কারো কবিতাই হচ্ছে না! যারা কথাগুলো বলেন তারা সৃজনশীল মানুষ, সৃষ্টির যন্ত্রণা তাদের ভালো করেই জানা আছে, তবু তারা কীভাবে এত অবলীলায় অন্যের সৃষ্টিকর্মকে খারিজ করে দেন, বোঝা মুশকিল। আবার তারা ঠিক পরিষ্কার করে বলেনও না যে, কেন অমুকের কবিতা হচ্ছে না, বা কবিতা বলতে তিনি নিজে কী বোঝেন! ফলে এসব কথাবার্তা যুক্তিহীন বাগাড়ম্বরে পরিণত হয়। অথচ এই খারিজ করে দেবার ব্যাপারটিও যদি যুক্তিসম্মত উপায়ে ঘটতো; যিনি বলছেন, তিনি যদি নিজের অবস্থানটি পরিষ্কার করতেন, কবিতা-গল্প-উপন্যাস সম্বন্ধে তার নিজের বক্তব্য হাজির করে গ্রহণ-বর্জনের তালিকা করতেন, তাহলে আমাদের সৃজনশীলতার জগতে নতুন মাত্রা যুক্ত হতো, শিল্প সম্বন্ধে নতুন নতুন চিন্তার প্রকাশ ঘটতো, তৈরি হতো সাহিত্যচর্চার মননশীল পটভূমি! সত্যি বলতে কি, একজন মানুষের বর্জনের তালিকা দেখে কখনোই তার শিল্পচৈতন্যের স্তরটি বোঝা যায় না, যেমন বোঝা যায় না শুধুমাত্র গ্রহণের তালিকা দেখেও। তালিকা দরকার দুটোরই— বর্জনের যেমন, তেমনই গ্রহণেরও। আমি অবশ্য কোনো লিখিত তালিকার কথা বলছি না। একথাও বলছি না যে, প্রত্যেক পাঠকেরই উচিত একটা করে গ্রহণ-বর্জনের তালিকা করে নিজ নিজ ঘরে টানিয়ে রাখা। বলছি তাদের কথা, যারা অকাতরে সবকিছু খারিজ করে দেন! লিখিত না হলেও মৌখিক একটা তালিকা তাদের থাকা উচিত, যাতে আমরা অন্তত জিজ্ঞেস করে জানতে পারি— কোনটিকে তার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়! কবিদের অবশ্য অনেক সুবিধা। তারা এরকম কোনো তালিকার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে অবলীলায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাগৈতিহাসিক কালের কোনো এক বা একাধিক কবির নাম বলে দেবেন, যাদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্নই নেই। সমকালের কারো নাম তো বলবেনই না, এমনকি অগ্রজদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন তাদের নামও তাদের মুখে সচরাচর শোনা যাবে না। জীবনানন্দের নাম তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হলেও, বা বড়োজোর বিনয়-উৎপল-শক্তির নাম কখনো কখনো শোনা গেলেও অথবা জয় গোস্বামীর নাম কিঞ্চিৎ কুণ্ঠাসহ বললেও এর নিচে আর নামেন না তারা! আবুল হাসান মরে বেঁচেছেন, তরুণ কবিরা তাঁর কথা খানিকটা লজ্জামেশানো কণ্ঠে হলেও বলে থাকে, কিন্তু এ ছাড়া বাংলাদেশে কোনো কবিই নেই, তিনি নিজে ছাড়া! অবশ্য আল মাহমুদের নামও উচ্চারিত হয়, তবে ক্ষোভের সঙ্গে। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শই ওই ক্ষোভের কারণ! উপন্যাসের ব্যাপারেও একইরকম মতামত শোনা যায়! বাংলাদেশে নাকি কোনো উপন্যাসই রচিত হয়নি! আর গল্প? ওগুলো তো পড়া যায় না! এই হচ্ছে আমাদের যে-কোনো সাহিত্য-আড্ডার সাধারণ চিত্র! এই ধরনের মানসিকতা যদি সৃজনশীল মানুষদের মধ্যে থাকে তাহলে সে দেশে সমালোচনার অবস্থা কী দাঁড়াবে, সহজেই অনুমেয়!

২

একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়— সৃজনশীল মানুষরা সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না। আমাদের দেশে তো বটেই, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও সমালোচকদের সঙ্গে একমত হতে পারেন না লেখকরা। শুধু তাই নয়, সমালোচকদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার ব্যাপারটিও পৃথিবীর প্রায় সবদেশের লেখকদেরই প্রিয় একটি কাজ। আর সৃজনশীল লেখকদের এইসব উপহাস, কটূক্তি ও আক্রমণ প্রায় মুখ বুজেই সহ্য করে যেতে হয় সমালোচকদের। এ প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশের সেই অতি বিখ্যাত কবিতাটির কথা নিশ্চয়ই মনে পড়বে সবার :

'বরং নিজেই তুমি লেখো নাকো একটি কবিতা—'
বলিলাম ম্লান হেসে; ছায়াপি দিলো না উত্তর;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়— সে যে আরূঢ় ভণিতা ঃ
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের 'পর
ব'সে আছে সিংহাসনে- কবি নয়— অজর, অক্ষর
অধ্যাপক; দাঁত নেই— চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি;
বেতন হাজার টাকা মাসে— আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি;
যদিও সে-সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিলো— হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিলো লুটোপুটি।
[সমারূঢ়/জীবনানন্দ দাশ]

'ছায়াপিণ্ড' সমালোচক কবির ছুঁড়ে দেয়া চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে নীরব থেকেছে, কারণ সে কবি নয়, অজর অক্ষর অধ্যাপক— যার দাঁত নেই, আর চোখে পিঁচুটি; অধ্যাপক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসেবে যে বেতন পান তারচেয়ে বেশি পান 'মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটে' ইত্যাদি। সমালোচকদের সম্বন্ধে কী ভয়াবহ সব কথাবার্তা! জীবনানন্দের এই উচ্চারণ হয়তো খানিকটা অসহিষ্ণু আর কঠোর বলেই মনে হবে সমালোচকদের কাছে, হয়তো তারা এটি পড়ে কিছুটা বিব্রত ও আহত হবেন, কিন্তু কবিতাটির মধ্যে তাদের জন্য শিক্ষণীয় অনেককিছুই আছে। জীবনানন্দ তাঁর জীবনকালে কম যন্ত্রণার শিকার হননি! সমালোচকরা তাঁকে রীতিমতো ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলেছেন, তাঁকে অবলীলায় খারিজ করে দিয়েছেন, কেউ বা বিপুল উপেক্ষায় তাঁর সম্বন্ধে কথা বলাটাকেও সময়ের অপচয় বলে মনে করেছেন, ব্যাপক মাত্রায় ঠাট্টা-বিদ্রুপ-উপহাসের মুখোমুখি হয়েছেন, কিন্তু স্বল্পবাক আর নির্জন মানুষ ছিলেন বলে সেগুলোর জবাব দেননি বা দিতে পারেননি তিনি; শুধু এই একটি কবিতা ছাড়া! অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সেইসব নিন্দুকেরা— যারা জীবনানন্দের সমালোচনায় মুখর থাকাকে নিজেদের জীবনের এক মহৎ দায়িত্ব বলে মনে করতেন— এখন আর কোথাও নেই, আছেন জীবনানন্দ। এমনকি জীবনানন্দকে বোঝার জন্য আমরা এখন আর তাদের সমালোচনাগুলো খুঁজে দেখি না, উল্টো কৌতূহলবশত খুঁজে দেখি তাদের সম্বন্ধে কবি নিজে কি বলেছেন! অহেতুক সমালোচনাকারীদের পরিণতি শেষ পর্যন্ত এই-ই হয়। আসলে সমালোচকদের সম্বন্ধে সৃজনশীল মানুষদের ক্ষোভের কারণ শুধুমাত্র লেখকদের অসহিষ্ণুতাই নয়, একই সঙ্গে সমালোচকদের দায়িত্বজ্ঞানহীন অহেতুক সমালোচনাকেও এর জন্য দায়ী করা চলে।

সমালোচকদের প্রতি তীব্র বিদ্রুপ হানার আরেকটি উদাহরণ স্যামুয়েল বেকেটের বিশ্বখ্যাত নাটক 'ওয়েটিং ফর গডো'তে পাওয়া যাবে। এই নাটকের দুই প্রধান চরিত্র— ভ্লাডিমির আর এস্ট্রাগন— গডো নামক এমন অনির্দিষ্ট একজনের জন্য অনির্দিষ্টকাল ধরে অপেক্ষা করে যাকে তারা চেনে না বা কোনোদিন দেখেওনি। তবে তারা বিশ্বাস করে, গডো এলে তাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, পৃথিবী তাদেরকে যে ক্লেদাক্ত জীবন উপহার দিয়েছে তা থেকে তারা মুক্তি পাবে। পরপর দুদিন তারা অপেক্ষা করে কিন্তু গডো দুদিনই খবর পাঠান যে, তিনি আজ আসতে পারছেন না— কালকে নিশ্চয়ই আসবেন। পুরো নাটকটি পড়লে মনে হয়— তারা চিরদিনই অপেক্ষা করে ছিলো, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। কোনোদিনই তাদের এই অপেক্ষার অবসান হবে না এবং গডো কোনোদিনই আসবেন না। সব প্রতীক্ষাই নিরর্থক ও নিষ্ফল, সবকিছুই অনিশ্চিত ও ফলাফলশূন্য জেনেও তারা প্রতীক্ষাই করে। আর প্রতীক্ষার এই দুঃসহ প্রহর পার করার জন্য তাই অনেক উদ্ভট কাণ্ড করে তারা— অর্থহীন আলাপ করে, পরস্পরের কথার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে, পরস্পরকে অর্থহীন প্রশ্ন করার ও গালাগাল করার চেষ্টাও বাদ যায় না, সৌজন্য ও ভদ্রতার অভিনয় করে, নিজেদের অন্য চরিত্রে কল্পনা করে ছেলেমানুষি খেলায় মেতে থাকে কিছুক্ষণ, টুপি আদান-প্রদান কিংবা জুতো পড়ার চেষ্টায়ও কিছুটা সময় কাটে, এবং তারা যে টিকে আছে 'সে ধারণা জন্মাবার মতো একটা না একটা কিছু' সবসময় পেয়েই যায় বলে সন্তুষ্টি বোধ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতীক্ষার তেমনই এক মুহূর্তে তাদের সংলাপ, যেখানে তারা পরস্পরকে গালাগালি করার চেষ্টা করছে, দেখুন—

ভ্লাডিমির : ...শিম্পাঞ্জি
এস্ট্রাগন : ...শুয়োর
ভ্লাডিমির : পাঁঠা
এস্ট্রাগন : উকুন
ভ্লাডিমির : গর্ভস্রাব
এস্ট্রাগন : মরপিয়ন
ভ্লাডিমির : ড্রেনের ছুঁচো
এস্ট্রাগন : সহকারী পাদ্রী!
ভ্লাডিমির : শুশুক
এস্ট্রাগন : [চরম আঘাত হানার সুরে] সমালোচক!
ভ্লাডিমির : ওহ! [মুষড়ে পড়ে, পরাজিত, মুখ ঘুরিয়ে নেয়]

মানে হলো, 'সমালোচক' শব্দটিই সবচেয়ে শক্তিশালী এবং চূড়ান্ত গালি, এরচেয়ে বড়ো গালি আর হয় না, আর তাই এই গালি শোনার পর মুষড়ে পড়তে হয়, পরাজিত হতে হয়, বিনিময়ে আরেকটি গালি ফিরিয়ে দেয়া যায় না— এটিই যে সর্বশেষ এবং সবচেয়ে বিধ্বংসী গালি! বুঝুন অবস্থা! সমালোচকদেরকে কী ভয়াবহ উপহাস ও বিদ্রুপের মুখোমুখি হতে হয়, 'সমারূঢ়' কবিতার মতো এটিও তার এক চমৎকার প্রমাণ দেয়!

৩

'সাহিত্য সমালোচনা কীভাবে সম্ভব?' শিরোনামের লেখাটিতে হাসনান আজিজুল হকও সমালোচকদের কাণ্ড জ্ঞানহীন কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করেছেন। নিচের অংশটুকু দেখুন, বিচ্ছিন্নভাবে কিছু লাইন তুলে আনা হয়েছে এখানে–

'সমালোচনা কী সম্ভব? সমালোচনার জন্য যে আলাদা একটা সাহিত্য আছে তা কতটা ধোপে টেকে? কড়া সমালোচক, নিরপেক্ষ সমালোচক, বিবেকবান সমালোচক মিন মিন করে বা মহা আড়ম্বর করে যে রায় দিয়ে আত্মতৃপ্তি বোধ করেন তার ভিত্তি কতটা মজবুত? তিনি শক্ত পায়ে দাঁড়াতে পারেন তো? ভাঁড়ের ভূমিকা নিতে হয় না তো তাকে? আসলে তিনি কি করেন সাহিত্য সমালোচনার বেলায়? সাহিত্যের ওপর চড়াও হওয়া ছাড়া প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি কী আর কিছু করতে পারেন?... তিনি বুঝতেও পারেন না তিনি ঠিক কী করছেন? যে খাবার হাজার লোকে খাবে, সেই খাবার খেয়ে একা তিনি হাজার খাদকের পক্ষ থেকে তার স্বাদ-গন্ধ ঘোষণা করছেন। সমালোচনার শেষ পরিণতি কী এখানেই গিয়ে ঠেকে?... অধিকাংশ সমালোচক একটা উপরের জায়গায় হাজির হতে চান, তিনি নিজে এই মৌলিক কথাটি ভুলে যান যে আগে শিল্প, তার পিছু পিছু শিল্পের সমালোচনা। আগে সাহিত্য সৃষ্টি, তারপর সাহিত্য সমালোচনা। যদি সাহিত্য না সৃষ্টি হয় সমালোচনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো জায়গা থাকে না। আগে মানুষ, তারপর তার ছায়াটা।... কাজেই সমালোচনাকে প্রথমে শিল্প ও সাহিত্যের স্বশাসন এবং স্বয়ম্ভরতা মেনে নিতে হবে। ... কিন্তু আমাদের এখানে উল্টোটা ঘটে। সমালোচক যদি বলে দেন এটা সাহিত্য হয়েছে, তাহলেই হয়েছে। সমালোচকের কখনোই মনে হয় না, তিনি এমন নিয়মকানুন বানাতে পারেন না, যা মেনে চললে শিল্প সাহিত্য সবার জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে। সাহিত্য-সংস্কৃতির সমালোচকের মনে প্রথমেই একটা অসম্ভব দম্ভ কাজ করে। দম্ভটা একেবারে অর্থহীন। কারণ সমালোচনা এক অর্থে পরগাছা, তা নির্ভর করে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির অস্তিত্বের উপর। এটা যদি প্রথমে মাথায় ঢোকে, তবে একটু বিনয় সমালোচনার মধ্যেও ঢুকে যেতে পারে।...সমালোচকের মধ্যে একটা রায় দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। সবার হয়ে কথা বলার কোনো অধিকার সমালোচককে কেউ দেয়নি। কিন্তু যে দম্ভ ও অহংকারের সঙ্গে রায় ঘোষণা করা হয়, তাতে সমালোচককে মনে হয় গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। ... বাংলা ভাষায় সুস্থিরভাবে সমালোচনা দাঁড়াতে পারেনি। বিশেষ করে আমাদের এখানে। সবাই তো গল্প উপন্যাস সাহিত্য কবিতা চিত্রকলায় আগ্রহী নয়। যারা এসব নিয়ে কথা বলেন তাদের মধ্যে এ ধারণা হয়েছে যে তারা যা বলছেন এবং বলবেন তার বাইরে কথা নেই।'

সৎ ও সহনশীল সমালোচনা-সাহিত্যের বিকাশের আকাঙ্ক্ষা থেকে রচিত এই লেখাটির উদ্ধৃত অংশটুকু পড়ে কি মনে হয় না যে, তিনি বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন সমালোচকদের ওপর? একথা সত্যি যে, 'যে খাবার হাজার লোকে খাবে' সেই খাবার খেয়েই সমালোচক তার স্বাদ-গন্ধ ঘোষণা করেন। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, সমালোচক 'একা' এবং 'হাজার খাদকের পক্ষ থেকে' তার স্বাদ-গন্ধ ঘোষণা করেন না। কোনো শিল্পের স্বাদ-গন্ধ ঘোষণার জন্য সমালোচক এককভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি নন, প্রত্যেক পাঠকই প্রকৃতপক্ষে একটি লেখার একেকজন সমালোচক, একেকজন স্বাদ-গন্ধ ঘোষক। এবং যদি ধরেও নিই যে, কোনো সমালোচক 'একা' এই স্বাদ-গন্ধ ঘোষণা করছেন, তবু সেটিকে হাজার পাঠকের পক্ষে করেছেন বলে মেনে নেয়া যায় না। একজন সমালোচক একান্তভাবেই নিজের মতটি প্রকাশ করেন, সেটি অন্য একজন পাঠকের সঙ্গে মিলতেও পারে, না-ও মিলতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেলে না, প্রত্যেক পাঠকই আলাদাভাবে শিল্পকে উপভোগ করেন। একজন সমালোচক চাইলেও সবার পক্ষ থেকে ওই স্বাদ-গন্ধ ঘোষণা করতে পারেন না।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, 'আগে শিল্প, তার পিছু পিছু শিল্পের সমালোচনা। আগে সাহিত্য সৃষ্টি, তারপর সাহিত্য সমালোচনা'— এবং কথাটা কোনো সমালোচক ভুলে যান বলেও মনে হয় না। প্রত্যেক সমালোচকই 'শিল্প ও সাহিত্যের স্বশাসন এবং স্বয়ম্ভরতা মেনে' নেন। এটি তাকে নিতেই হয়। একজন নির্বোধ সমালোচকও কখনো নিজের সমালোচনাকে শিল্প-সাহিত্যের চেয়ে মৌলিক ও স্বয়ম্ভর বলে মনে করেন না। তবে সমস্যাটি হয় অন্য জায়গায়। সমালোচকদের লেখায় নির্মোহতা কম থাকে, আবেগের পরিমাণ থাকে বেশি, ফলে আবেগজনিত কারণে ভালোলাগা ও বিরক্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশটিও তীব্র হয়ে থাকে, আর সেটিকেই 'রায় ঘোষণা' বলে মনে হতে পারে কারো-কারো কাছে। তবে ধারণা করি, কোনো সমালোচক যদি আবেগবশত ও আনন্দের আতিশায্যে এরকম কিছু বলে বসেন— 'অমুক' লেখক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের একজন, তাহলে ওই অমুক লেখক— এই রায় ঘোষণায় খুশিই হবেন! আবার যদি উল্টোটা ঘটে, অর্থাৎ যদি ওই একই সমালোচক ওই একই লেখক সম্বন্ধে বলে ফেলেন— অমুকের লেখা কিচ্ছু হয়নি, তাহলেই হয়েছে! যে লেখক প্রথমোক্ত রায় ঘোষণায় খুশি হয়েছিলেন, তিনিই সেই সমালোচকের ওপর এবার ঝাঁপিয়ে পড়বেন, সমালোচকের কাণ্ড জ্ঞানহীনতা নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন, কিংবা প্রকাশ না করলেও গভীরভাবে বিরক্ত হবেন! অতএব, সমালোচনার নামে যা কিছু ঘটছে, তার দায় এক পক্ষের নয়! সমালোচক ঠিক যতোটা আবেগের সঙ্গে তার ভালোলাগা বা বিরক্তি প্রকাশ করেন, সৃজনশীল মানুষরা ঠিক ততোটাই তীব্রতার সঙ্গে সেটা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করেন। শ্রেয়বোধের ব্যাপারটা ক্ষণে ক্ষণে পাল্টায়। এমন কোনো সৃজনশীল মানুষকে হয়তো খুঁজেই পাওয়া যাবে না, যিনি নিজের প্রশংসায় খুশি হন না, নিজের সমালোচনায় অল্প হলেও ক্ষুব্ধ হন না, এবং অন্য কোনো লেখককে (বিশেষ করে সমকালের লেখককে) নেতিবাচকভাবে সমালোচিত হতে দেখলে মনে মনে আনন্দিত হন না। তাহলে সমালোচকের আর দোষ কী? তার এই ধরনের সমালোচনার প্রবাহ অব্যাহত থাকে তো এইসব সৃজনশীল মানুষদের কারণেই।

৪

ওই একই লেখায় একটি চমৎকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন হাসান আজিজুল হক :

> 'সমালোচনা সত্যি সত্যি শিল্প-সাহিত্যের কোন কাজে লাগে, সে সংক্রান্ত সম্ভাব্য প্রশ্নগুলো আমরা বিবেচনা করতেও চাই না। আমরা মার্কেস পড়ি কতটা আর কতটা মার্কেসের সমালোচনা পড়ি? মার্কেসের সমালোচনা পড়ব কিন্তু মার্কেস আদৌ পড়ব না, তাতে মার্কেসকে কতটা বোঝা যায়? মার্কেসের সমালোচনা পড়ব এবং মার্কেসকেও পড়ব, তাতে কতটা বেশি বোঝা যায়? আর সমালোচনা একবারেই পড়ব না, শুধু মার্কেস পড়ব তাতেই বা কতটা বোঝা যায়?'

খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এগুলো। বলাবাহুল্য, শুধুমাত্র সমালোচনা পড়ে কেউ যদি শিল্পের স্বাদ পেতে চান, তাহলে বলতে হবে, তিনি বড়োজোর ঘোলের স্বাদ পাবেন, দুধের স্বাদ পুরোপুরিই অধরা রয়ে যাবে তার কাছে। সবচেয়ে ভালো হয়, সমালোচনা একবারেই না পড়ে আগে মূল লেখাটি পড়া, তাতে ওই লেখাটি সম্বন্ধে পাঠকের একটি নিজস্ব বোঝাপড়া তৈরি হবে। এরপর মন চাইলে তিনি সমালোচনা পড়তে পারেন শুধু নিজের মতটি অন্যের মতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্য। তবে তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়— সমালোচনার কী আদৌ প্রয়োজন আছে? সমালোচনা কী অন্য পাঠকদের পাঠ-সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে? আমি মনে করি, পারে। অনেক সময়ই কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি শিল্পকর্ম সম্পূর্ণভাবে একজন পাঠকের কাছে বোধগম্য হয় না, সমালোচনা সেই না-বোঝা অংশটুকুতে আলোকপাত করতে পারে। অবশ্য সম্পূর্ণভাবে বোধগম্যতায় প্রবেশ না করলেও একটি শিল্পকর্ম সম্বন্ধে ভোক্তার নিজস্ব একটি মতামত জন্ম নেয়। বলাবাহুল্য যে, সব পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়, আর তাই একেকজন পাঠকের বিভিন্ন ধরনের মতামত রচনাটির ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা আবিষ্কারে সহায়তা করে। শিল্পের যে বহুমাত্রিকতা সেটি ধরা পড়ে ওইসব সমালোচনাতেই, এবং এতসব ভিন্ন ভিন্ন মতামত পেতে পেতে কেউ যদি প্রশ্ন করে বসেন— এর মধ্যে কোনটি সঠিক, তাহলে মারাত্মক ভুল হবে। শিল্পের কোনো ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত নয়। শিল্প সম্বন্ধে কারো কথাই শেষ কথা নয়। এমনকি আমি এইমাত্র যে বাক্যটি বললাম, সেটিও শেষ কথা নয়! শিল্পের সমালোচনার জন্য আমরা যেসব বিষয় নিয়ে কথা বলি— ভাষা বা বিষয় বা ছন্দ বা রঙ বা প্রতীক বা ব্যঞ্জনা বা এককথায় শিল্পের করণকৌশল কিন্তু শিল্পের অংশমাত্র, শিল্পের পুরোটা নয়। ওগুলোকে ব্যাখ্যা করে যদি আমরা শিল্পকে বুঝতে চাই তাহলে ভুল হবে। শিল্প সবমিলিয়ে অনুভব ও উপলব্ধির বিষয়। কেউ যদি অনুভবকে ব্যাখ্যার সাহস ও যোগ্যতা রাখেন তাহলে তিনি তা করতেই পারেন। কিন্তু একজন মানুষ, ধরা যাক তিনি খুবই প্রতিভাবান মানুষ, যে ব্যাখ্যা দেবেন সেটি তার নিজস্ব উপলব্ধিজাত ব্যাখ্যা। অন্য একজনের কাছে ওই একই শিল্প একই উপলব্ধিতে ধরা না-ও দিতে পারে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়জন ব্যাখ্যা করবেন ভিন্নভাবে। এবং সেটিকে ভুল বলে খারিজ করে দেবারও কোনো উপায় নেই।

আর এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক একটা প্রশ্ন উঠতেই পারে— তাহলে শিল্প নিয়ে আলোচনার উপায় কী? একটি সম্ভাব্য উপায় ভাবা যেতে পারে— এ নিয়ে স্বয়ং শিল্পীই কথা বলবেন। একটি শিল্প কীভাবে জন্ম নেয়, কোন অনুভব থেকে শিল্পী তাঁর শিল্প রচনা করেন, শিল্পের কাজ কী, মানুষ ও সমাজের জন্য শিল্পের ভূমিকা কী, শিল্পের শক্তি কোথায়, সীমাবদ্ধতাই বা কোথায়, শিল্পীর দায় বলতে শিল্পী নিজে কী বোঝেন— এসব নিয়ে শিল্পীরা যদি কথা বলেন তাহলেই কেবলমাত্র শিল্প সম্বন্ধে কিছু ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে পাঠকদের পক্ষে। কিন্তু শিল্পীদের কথাই কি শেষ কথা? না, তা-ও নয়! বস্তুত, শিল্পের ব্যাখ্যার জন্য আমি শিল্পীদের শরণাপন্ন হতে চাই না, তিনি যা বলার তা তো ওই শিল্পেই বলে ফেলেছেন, নতুন করে আবার তার কাছে জানতে চাওয়াটা ঠিক বিবেচনাপ্রসূত বলে মনে হয় না। তবু আমরা জানতে চাই, একটা ব্যাখ্যাও পাই, কিন্তু তাতেও সবকিছু বুঝে ওঠা যায় না। পাঠক বা সমালোচক হয়তো একটা কিছু বুঝে নিয়েছেন, শিল্পী হয়তো তার প্রেক্ষিতে বলেছেন— আমি ঠিক এরকম কিছু বোঝাতে চাইনি, আমি বোঝাতে চেয়েছি... ইত্যাদি। কিন্তু যা শিল্পী নিজে বোঝাতে চাননি, পাঠক/সমালোচক সেটাই বুঝে নিয়েছেন, এর মানে কী? এটা কী শিল্পীর ব্যর্থতা নাকি শিল্পের ঐশ্বর্য? আমার দ্বিতীয়টিই মনে হয়। শিল্প এমন অনেককিছুই ধারণ করে রাখে, যা স্বয়ং শিল্পস্রষ্টাও জানেন না, হয়তো অন্য কোনো পাঠকের কাছে সেটি ধরা পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন শিল্পী কেন তার নিজের শিল্পকর্মকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারেন না, তার একটি ইঙ্গিত আমি দিয়েছিলাম আমার নিজের লেখা 'সংশয়ীদের ঈশ্বর' রচনায়। পূনরাবৃত্তির দায় নিয়েও কুণ্ঠার সঙ্গে সেখান থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

> 'একজন সৃষ্টিশীল মানুষের মনোজগৎ বোঝা সহজ কাজ নয়। লেখকের সাহিত্যকর্ম, শিল্পীর শিল্পকর্ম, বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ইত্যাদি দিয়ে সংশ্লিষ্টদের দার্শনিক উপলব্ধির জগৎটি খানিকটা বোঝা গেলেও মনোজগৎ বোঝা দুষ্কর। এর কারণ দুটো। প্রথমতঃ সৃষ্টিশীল মানুষটি যতোই প্রতিভাবান হন না কেন, তাঁর উপলব্ধির খুব কম অংশই তিনি শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করে যেতে পারেন— অধিকাংশটুকুই রয়ে যায় অপ্রকাশিত অবস্থায়। হয়তো প্রকাশ করার মতো উপযুক্ত ভাষা বা প্রকরণ খুঁজে পান না তাঁরা। কিন্তু এসবের চেয়ে সত্যি কথাটি হয়তো এই যে, সেই উপলব্ধিকে যথার্থভাবে প্রকাশ করতে পারাটাই এক অসম্ভব ব্যাপার। যে সুগভীর মগ্নতার ভিতর এঁদের কাছে সেই মহামহিম রূপটি ধরা দেয়, সচেতন হলেই সে হারিয়ে যায়, কেবল রয়ে যায় তার রেশটুকু। এখানে সেই মগ্নতার কথাটিও একটু বলা দরকার। মানব-ইতিহাসের যেসব মহান সৃষ্টিকর্ম দেখে আমরা বিস্মিত ও অভিভূত হই, তার অধিকাংশই ওই মগ্নতা থেকে উৎসারিত। সাহিত্যশিল্পীর সাহিত্যকর্ম, বিজ্ঞানীর তত্ত্ব, সংগীতজ্ঞের কথা ও সুর— এসবকিছুর মধ্যে যেগুলো কালজয়ী হয়, যুগ যুগ ধরে আমাদের আপ্লুত, বিমোহিত ও অভিভূত করে যায়— সেগুলোর জন্ম যেন কোনো স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হয়নি বলে মনে হয় আমাদের, যেন কোনো অজানা-অচেনা সূত্র থেকে সেগুলোর আবির্ভাব ঘটেছে।... এক সুগভীর মগ্নতা তাঁদেরকে (শিল্পীদেরকে) দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আর ওই মগ্নতা, সাধনা, ধ্যানই জন্ম দেয় ওরকম অভূতপূর্ব সব বৈজ্ঞানিক ধারণা, অসামান্য সুর, ব্যাখ্যাতীত সাহিত্য ইত্যাদির। মগ্ন থাকেন বলে এঁরা বিচ্ছিন্ন থাকেন দৈনন্দিন বাস্তবতা থেকে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাত্যহিকতা থেকে, আর এই শিল্পীরা মনে করেন— তাঁদের সৃষ্টিকর্মের জন্ম হয়েছে কোনো অজানা উৎস থেকে, এসবের পেছনে যেন কারো হাত আছে, এসব যেন তাঁরা সৃষ্টি করেন না, তাঁদেরকে ধরা দেয়! (আমাদের অন্যতম প্রধান কথাসাহিত্যিক মাহমুদুল হক আমাকে একবার বলেছিলেন : 'নিজের লেখাগুলো পরে পড়তে গিয়ে মনে হয়— লেখার সময় আমি যেন অন্য কারো করতলে ছিলাম, মনে হয় ওগুলো আমি লিখিনি, আমাকে দিয়ে অন্য কেউ লিখিয়ে নিয়েছে!' আমার কবিবন্ধুদের কাছেও প্রায়ই কবিতা 'আসা'র কথা শুনি। কোত্থেকে আসে, জানতে চাইলে তারা এ প্রশ্নের উত্তরও দেন না!)'

যে ধ্যানমগ্নতা এইসব শিল্পকর্মের জন্মপ্রক্রিয়ার উৎস, সচেতন মন তাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে? লেখার টেবিল থেকে উঠে যাওয়ার পর সেই শিল্পকর্ম সম্বন্ধে শিল্পস্রষ্টার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও তাই খুব একটা কাজে দেয় না। প্রশ্ন করা যেতে পারে, সুগভীর এক মগ্নতার ভিতর কোনো এক অজানা ঘোরের ভিতর যে লেখক লেখালেখি করেন, তার সঙ্গে জীবনযাপনে ক্লান্ত-বিপন্ন-অসহায় ব্যক্তি-লেখকের কী কোনো সম্পর্ক আছে? কখনো নেই, একেবারে নেই; আবার কখনো মনে হয় আছে, নিশ্চয়ই আছে। প্রশ্নটি ক্রমশই জরুরী হয়ে উঠছে। মানুষের শিল্পীসত্ত্বা আর ব্যক্তিসত্ত্বা কি এক না আলাদা, কোনো সম্পর্ক কি আছে তাদের মধ্যে নাকি নেই— প্রশ্নটি এভাবে উত্থাপন করে ছড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়া যায় সৃজনশীল কর্মে নিয়োজিত সবার কাছেই। উত্তর দেয়াটা কারো জন্যই, সম্ভবত, সহজ হয়ে উঠবে না। ওই যে একেকসময় একেকটা মনে হয় যে! কিন্তু এখন এমন দোদুল্যমান অবস্থায় থাকলেও কোনো একসময় আমার মনে হতো— আমার শিল্পীসত্ত্বা এবং ব্যক্তিসত্ত্বা এক ও অভিন্ন এবং অবিচ্ছেদ্য। একটি থেকে আরেকটি সরিয়ে নিলে অন্যটিরও মৃত্যু ঘটবে। মনে হতো, জীবন যাপনের জন্য যা কিছু করি— এই চাকরি-বাকরি, সংসারযাপন, সামাজিক অনুষ্ঠান-আয়োজনে অংশগ্রহণ, কিংবা বাজারে যাওয়া বা দোকানে যাওয়ার মতো আপাত তুচ্ছ কাজগুলো— তা আমার শিল্পীসত্ত্বাকে আদৌ স্পর্শ করে না। মনে হতো— আমি বাঁচি শিল্পের জন্য, সবসময় থাকিও সেই ঘোরেই, অন্য কাজগুলো করি না করার মতো করে। ফলে আমার কাছ থেকে মাছওয়ালা সহজেই ন্যায্য দামের চেয়ে দ্বিগুন মূল্য খসিয়ে নিতে পারে, এমনকি আমার কমনসেন্সও কাজ করে না সেসব ক্ষেত্রে, আর বাসায় এসে এর জন্য কটূকথা শুনেও ভাবান্তর হয় না, যেন ওটা কোনো ব্যাপারই নয়! মনে হতো, লেখার টেবিলে আমি যখন বসি তখন প্রাচীনকালের মহাপরাক্রমশালী রাজার মতোই বসি। কিন্তু বাস্তবতার চাবুকে রক্তাক্ত হতে হতে সেই বিমূর্ত সত্ত্বাটি হুমকির মুখে আজ, ধারণাটিতেও ফিকে হতে বসেছে। যখন দেখি— সমস্ত কিছু দাঁড়িয়ে আছে শিল্পের বিরুদ্ধে; যখন দেখি পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্র কোনোটিই আর সহায়ক হয়ে উঠছে না শিল্পের জন্য বরং অবস্থান নিচ্ছে বিরুদ্ধে, যখন দেখি লেখার টেবিলে কাগজের ওপর কলম নিয়ে উবু হয়ে বসা লোকটির সমস্ত মগ্নতা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে আকস্মিক এক চিৎকারে, একজন লেখক যে লিখছে এই বিষয়টি কারো কাছে কোনো গুরুত্বই পাচ্ছে না, তখন ঘোরভাঙা যন্ত্রণায় টেবিল থেকে উঠে আসা লোকটিকে আর রাজা নয়, নিতান্তই ভিখারীর মতো নিঃস্ব আর রিক্ত বলে মনে হয়। লেখার টেবিলে রাজার মতো বসে থাকা লোকটির কর্মকাণ্ড কি ব্যাখ্যা করতে পারবে টেবিল থেকে উঠে আসা নিঃস্ব-রিক্ত ভিখারির মতো লোকটি? কখনো, কোনোদিন?

৫

সমালোচকদের সীমাবদ্ধতার জায়গাটি না হয় বোঝা গেলো, আবেগপ্রবণ হয়ে কোনো-কোনো লেখাকে ইতি- বা নেতিবাচকভাবে অতিমূল্যায়ন করে থাকেন তারা, আর সেটাই রায় ঘোষণার মতো শোনায়, মনে হয় এর পরে আর কোনো কথা নেই! বোঝা গেলো এ-ও যে, সমালোচনার ক্ষেত্রে আবেগটাকে সরিয়ে রাখাই বিবেচনাপ্রসূত কাজ, কিন্তু সেই বিবেচনাবোধটি যথেষ্ট মাত্রায় সমালোচকদের মধ্যে নেই। তারা সাহিত্য পাঠ করেন আবেগ দিয়ে, আলোচনাও করেন আবেগ দিয়ে। একাডেমিক আলোচনায় আবেগ তো সর্বদা পরিত্যাজ্য, কিন্তু আমাদের এখানে সমালোচনার ব্যাপারটা শুধু একাডেমিশিয়ানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। সত্যি বলতে কি তাদের যে কোনো অস্তিত্ব আছে সাহিত্য জগতে, সেটিও বুঝবার উপায় নেই, সমালোচনা জগতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাডেমিশিয়ানদের অবস্থা এরকমই করুণ। সমালোচনাটা তাই চলছে প্রায় পুরোপুরিই সৌখিন সমালোচকদের হাত ধরে, যারা এইসব প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-কানুন সঙ্গতকারণেই থোড়াইকেয়ার করেন। সবমিলিয়ে সমালোচনা-সাহিত্য লেজেগোবরে একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এসবই সমালোচকদের সীমাবদ্ধতা, বুঝলাম, কিন্তু লেখকদের সমস্যাটা কী? তারা কেন সমালোচনাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন না, বিশেষ করে সেটি যদি নেতিবাচক সমালোচনা হয়? বোঝা-না-বোঝা নিয়েও লেখকদের মধ্যে প্রায়ই আক্ষেপ দেখা যায়! নিজেদের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে তারা যখন কথা বলেন, দেখা যায়, সেই ব্যাখ্যা সমালোচকদের ব্যাখ্যার সঙ্গে কিংবা পাঠকদের নিজস্ব বোঝাপড়ার সঙ্গে মিলছে না। লেখকরা নিজেরাই উচ্চকণ্ঠ হলে পাঠক-সমালোচকের কণ্ঠ চাপা পড়ে যায়, এবং সবাই লেখককৃত ব্যাখ্যাটিকেই মেনে নিতে দ্বিধা করেন না! সবাই যেন ভুলে যান যে, লেখক নিজে তার লেখা সম্বন্ধে সঠিক ব্যাখাটি দেয়ার ক্ষমতা রাখেন না! অবশ্য সব লেখক উচ্চকণ্ঠ হন না, পৃথিবীর অধিকাংশ লেখকই নিজের লেখা সম্বন্ধে সৌজন্যবশত নীরব থাকেন, সমালোচকদের সমালোচনা সম্বন্ধেও কোনো মন্তব্য করেন না। কিন্তু প্রায় সবাই একধরনের হতাশায় ভোগেন— তাকে কেউ বুঝলো না! আসলে সমস্যাটি কোথায়? একটি লেখা নিয়ে যখন পাঠক-সমালোচকরা কথা বলেন তখন তো বোঝাই যায়, যে, তারা লেখাটিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন; নইলে তো তারা ওটা নিয়ে কথাই বলতেন না। এই গুরুত্ব পাওয়ার পরও কেন কোনো-কোনো লেখক মনে করেন— তাকে কেউ বুঝলো না! প্রশ্নটি অন্যভাবেও করা যায়। একটি লেখার লেখককৃত মূল্যায়নই কী শেষ কথা? এর বাইরে কী অন্য কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নেই? যদি না-ই থাকে তাহলে যেসব লেখক নিজেদের লেখালেখি নিয়ে কথা বলতে কুণ্ঠা বোধ করেন, তাদের লেখা আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করবো? আর যদি থাকে তাহলে লেখকদের এত মর্মাহত হওয়ার কারণ কী? সমস্যাটি জটিল, তবে সমাধানের অযোগ্য নয়! একজন লেখক যা-ই লিখুন না কেন, তিনি যে তাঁর নিজস্ব কিছু উপলব্ধির কথা আপামর পাঠককে জানাতে চান, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যা কিছু তিনি জানাতে চান এবং যেভাবে জানাতে চান তার সবটুকু হুবহু একইভাবে তার উদ্দিষ্ট পাঠকের কাছে পৌঁছে যাবে— এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। অর্থাৎ লেখক যা বোঝাতে চাইলেন, পাঠক যে সেটিই বুঝে নেবেন এমন কোনো কথা নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে— এটা কী ওই লেখকের ব্যর্থতা? না, সাফল্য-ব্যর্থতার প্রশ্ন এটা নয়, প্রকৃতপক্ষে একটি সফল রচনাকে পাঠক তার নিজের মতো করে গ্রহণ-বর্জন করেন। একই রচনা যে ব্যক্তিভেদে ভিন্নমাত্রা ধারণ করার ক্ষমতা রাখে, শিল্পের মূল শক্তি সেটাই। ব্যক্তিভেদে শিল্পের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাল্টে যায়, কেউ কেউ সেই ব্যাখ্যাটিকে অন্যের সামনে প্রকাশ করেন, সমালোচক তেমনই একজন মানুষ। অধিকাংশ মানুষই সেটা করেন না, নিজের মতো করে তিনি পাঠ করেন, গ্রহণ-বর্জন করেন, কিন্তু সেই গ্রহণ-বর্জনের মাপকাঠিটি প্রকাশ করেন না, নিজের মধ্যেই রেখে দেন। যদি সবাই প্রকাশ করতেন তাহলে একটি কবিতা সম্বন্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তত কয়েক লাখ পাঠকের কয়েক লাখ ভিন্ন ধরনের মতামত পাওয়া যেত বলে ধারণা করি। এই যে প্রকাশবিমুখ বিপুল নীরব পাঠকগোষ্ঠী, এঁরাই একজন লেখকের জন্য মূল ভরসার জায়গা, এঁরাই যুগ যুগ ধরে একটি লেখাকে টিকিয়ে রাখেন, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে একটি লেখাকে পৌঁছে দেন। লেখাটি তিনি নিজে কাজে লাগান, অন্যেকেও কাজে লাগাতে অনুপ্রাণিত করেন। হয়তো নিছক আনন্দের জন্যই তিনি পড়েন এবং অন্যদের পড়তে বলেন, অথবা লেখাটি নানাভাবে তাদের মানসগঠনে প্রভাববিস্তারি ভূমিকা রাখে বলে কৃতজ্ঞতাবশত অন্যের কাছে পৌঁছে দেন, এবং এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের সময় লেখক এই লেখাটি সম্বন্ধে কী বলেছেন বা কোনো জাঁদরেল সমালোচক লেখাটি কীভাবে কাটাছেঁড়া করেছেন সেসবের থোড়াইকেয়ার করেন। পাঠক সার্বভৌম। একটি লেখা লেখকের হাত ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর পাঠকের কাছে সে নতুনভাবে নির্মিত হয়, তিনি নিজের গরজে পাঠ করেন, নিজের মতো করে বুঝে নেন, নিজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণগুলো লোকজনকে জানানোর জন্য কলম খুলে লিখতে বসে যান না, বরং আরেকজনকে লেখাটি পড়ে দেখতে বলেন এবং ওই আরেকজনের ওপর তার নিজের কোনো মতামত চাপিয়ে দেন না, যেহেতু তিনি নিজেও এটিকে নিজের মতো করেই উপভোগ করেছেন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, অন্যকেও তা-ই করতে দেন! এই সার্বভৌম, স্বয়ম্ভর পাঠককূলই শিল্পকে রক্ষা করার ও প্রবহমান রাখার মূল দায়িত্ব পালন করেন যুগ যুগ ধরে। লেখকদের তরফ থেকে সবচেয়ে বড়ো ধন্যবাদটি যদি কারো প্রাপ্য হয়, তাহলে তিনি বা তারা এই বিপুল পাঠকগোষ্ঠী। একজন লেখকের যা কিছু কৃতজ্ঞতা, তা-ও এই পাঠকদের কাছেই!

[রচনাকাল : নভেম্বর, ২০০৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পের শক্তি, শিল্পীর দায়

একজন লেখক কেন লেখেন, আমরা সবসময়ই সেটি জানার আগ্রহ প্রকাশ করি, কিন্তু একজন পাঠক কেন পড়েন তা জানতে চাই না কখনো। লেখকদের তো বাঁচিয়ে রাখেন পাঠকরাই। যে লেখক পঠিত নন, তিনি জীবিতও নন। এমনকি বিশ্বের দুরূহতম লেখক যাঁরা, যাঁদের লেখা বুঝতে হলে কঠোর কায়িক পরিশ্রমের চেয়েও বেশি পরিশ্রম করতে হয়, তাঁদেরকেও তো বাঁচিয়ে রাখেন তাঁদের হাতে গোনা গুটিকয় পাঠকই। সেই পাঠকরা কেন পড়েন, সেটা তো খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হওয়ার কথা! কেন পড়েন তারা, পড়ে কী লাভ হয় তাদের, না পড়লেই বা কী ক্ষতি হয়! জগতে তো বিনোদন উপকরণের অভাব নেই, সহজলভ্য বিনোদনও এখন ঘরে ঘরে বিদ্যমান, তবু সেসব বাদ দিয়ে বই পড়ার মতো একটা কষ্টসাধ্য কাজ কেন করেন তারা? আমরা অবশ্য প্রশ্নটিকে শুধুমাত্র সাহিত্যের পাঠকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শিল্পের অন্যান্য শাখার ভোক্তাদের কাছেও নিয়ে যেতে পারি। যেমন সংগীতপ্রিয়দের কাছে জিজ্ঞেস করতে পারি, কেন গান শোনেন তারা? চিত্রকলার সমঝদার লোকটির কাছে জানতে চাইতে পারি, এরকম বিমূর্ত শিল্পের কাছে তিনি কী পান? চলচ্চিত্র ও নাটকের দর্শকদের প্রশ্ন করতে পারি— কেন তারা এসব দেখেন? কিন্তু এসব প্রশ্ন পাঠক-শ্রোতা-দর্শকদেরকে করা হয় না। তার কারণ সম্ভবত এই যে, এটাকে কেউ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বলে মনেই করেন না। অথবা এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার বলে ধরে নেয়া হয় যে, পাঠকরা তো পড়বেই, শ্রোতারা তো শুনবেই, দর্শকরা তো দেখবেই; এটাই তো তাদের কাজ, এ নিয়ে প্রশ্ন করার কী আছে! অথচ তাদের কাছে প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হলে এবং প্রাপ্ত উত্তরগুলোর একটা বিশ্লেষণ দাঁড় করালে যে ফলাফল পাওয়া যাবে, হয়তো সেখানেই লুকিয়ে আছে শিল্প ও শিল্পীর দায়দায়িত্ব, শক্তিসামর্থ্য এবং শিল্পসাহিত্যের প্রায়োগিক কার্যকারিতা সম্বন্ধে কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর।

২

সাহিত্যের পাঠকদের দিয়েই শুরু করা যাক। ওপরের প্রশ্নগুলো করলে পাঠকদের কাছ থেকে সম্ভাব্য কী কী উত্তর পাওয়া যেতে পারে? এটা নিশ্চিত যে, কেউ কেউ বলবেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা সময় কাটনোর জন্য বা আনন্দ পাওয়ার জন্য বা বিনোদনের জন্য পড়েন। জানি, এই উত্তর শুনলে 'সিরিয়াস' লেখকগণ অতিশয় আহত হবেন, তাদের সর্বদা কুঁচকে থাকা ভ্রু আরো কুঞ্চিত হয়ে গেরো পড়ে যাবে। ভাববেন— আমার লেখা কেবল বিনোদনের জন্য পড়েন; আমার এত শ্রমের ফসল কেবল আপনার 'স্থূল' আনন্দ লাভের উপকরণ! সেক্ষেত্রে না পড়াই তো ভালো! এমনিতেই লেখকরা পাঠকদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে আনন্দ পান, তার ওপর এই 'বিনোদন' 'আনন্দ' ইত্যাদি শব্দগুলোতে তাদের নিঃশ্বাস এমনই তপ্ত হয়ে উঠতে পারে যে, পাঠকরা হয়তো পুড়ে ভস্মই হয়ে যাবেন! বিষয়টি তাই আলোচনার অবকাশ রাখে। আমি নিজে মনে করি, সব শিল্পের রসাস্বাদন শেষ পর্যন্ত বিনোদনই। তবে এই বিনোদনের মাত্রাটি একটু ভিন্ন। ব্যাপারটা বোঝার জন্য দুজন 'শিক্ষিত' (প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্থে) লোকের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যাদের একজন সাহিত্য পাঠ করেন, আরেকজন করেন না। এই দুজন মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম হয়তো একই ধরনের, কিন্তু তাদের মানস-কাঠামো, জীবন-যাপনের ধরন, বা চিন্তাভাবনার প্যাটার্ন কখনোই এক নয়! নিয়মিত পাঠে অভ্যস্ত একজন মানুষ মানসিক সূক্ষ্মতার এমন এক স্তরে ওঠেন যে, অপড়ুয়া লোকেরা যেসব বিষয়ে বিনোদন লাভ করেন— যেমন সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দেয়া, টিভিতে সস্তা সেন্টিমেন্টের নাটক-সিনেমা-হিন্দি সিরিয়াল দেখা ইত্যাদি— তিনি সেগুলো আদৌ উপভোগ করেন না। অথচ জীবনে বিনোদন প্রয়োজন, অন্যান্য মৌলিক চাহিদার মতো বিনোদনও মানুষের এক মৌলিক চাহিদা। তিনি যেহেতু প্রচলিত ও সহজলভ্য উপকরণগুলোতে বিনোদন পান না, তাকে তাই যেতে হয় এমন এক বা একাধিক মাধ্যমের কাছে যা তার মানসিক সূক্ষ্মতাকে সমর্থন দেবে। সেই অর্থে এটি তার কাছে বিনোদনই বটে, তবে উচ্চস্তরের বিনোদন। যে-কোনো ধরনের বিনোদনের সঙ্গে এটাকে মেলানো যাবে না। শুধু বিনোদনই নয়, এটি ওই পাঠকের জন্য এক ধরনের আশ্রয় হিসেবেও কাজ করে। শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যম যে মানুষকে আশ্রয় দেয় সেটিই শিল্পের দ্বিতীয় প্রায়োগিক দিক। মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই ভীষণ অসহায় প্রাণী। জীবন-যাপন করতে গিয়ে নানা ধরনের দুর্যোগ তো আসেই, কিন্তু অসহায়ত্বের কারণ শুধু এসব দুর্যোগই নয়। বরং জীবনের অর্থ অনুসন্ধান করেন যারা, যারা মানুষ-পৃথিবী-মহাবিশ্ব সৃষ্টির কারণ খোঁজেন, তাদের সামনে নানাবিধ প্রশ্ন এসে হাজির হয়। যতো প্রশ্ন আসে, ততো উত্তর মেলে না। অসহায়ত্বের সেটিও একটি কারণ। আর তাই, মানুষের আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়। সহজ-সামাজিক মানুষ যেসব আশ্রয় খুঁজে পান পারিবারিক-সামাজিক সম্পর্ক ও বন্ধনের মধ্যে, প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যে, এমনকি ধর্মের মধ্যেও; অনেক মানুষই এসবকিছুতে যথার্থ আশ্রয় খুঁজে পান না। এই দলের লোকেরা আশ্রয়ের জন্য শিল্পের দ্বারস্থ হন। শিল্পের ভোক্তামাত্রই এই আশ্রয়, প্রশান্তি ও নির্ভরতার ব্যাপারটি অনুভব করেন।

একথা সত্যি যে, সব শিল্প সমান নির্ভরতা ও প্রশান্তির আশ্রয় দেয় না। এই ক্ষেত্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভবত সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে সংগীত ও কবিতা। এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম যিনি সংগীত ভালোবাসেন না। আর যদি কেউ থেকেও থাকেন তিনি সম্ভবত ঠিক সুস্থ মানুষ নন। ব্যক্তিগতভাবে আমি এমন দু-চারজনের দেখা পেয়েছি, যারা গান শোনেন না। ধর্মীয় বিধিনিষেধের কারণে শোনেন না, তা নয়; আসলে তারা শোনার আগ্রহই বোধ করেন না, বা সুর তাদের প্রাণে বিন্দুমাত্র সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়। এবং অদ্ভুত শোনালেও সত্যি যে, এরা সবাই অসম্ভব নির্মম হৃদয়ের মানুষ, কোনো ঘটনাই তাদের মনে করুণার জন্ম দেয় না! কয়েকজন মাত্র মানুষকে দেখে এরকম কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত হবে না যে, যারা গান শোনেন না তাদের হৃদয় পাথর দিয়ে তৈরি। কিন্তু একথা নিশ্চয়ই বলা যায়— যারা শোনেন আর যারা শোনেন না তাদের মানসগঠন একইরকমের নয়! আবার এই শ্রোতাদের মধ্যেও শ্রেণীভেদ আছে, আছে প্রকারভেদ। কেউ কেউ কেবল শোনার জন্যই শোনেন, আর কেউ কেউ গানের প্রতি প্রেম অনুভব করেন। কেউ বা গান বলতে বাণী-সুর-গায়কি সমৃদ্ধ গানের কথা বোঝেন, কারো-কারো কাছে গান বলতে শুধু লিরিক সমৃদ্ধ গান নয়, কেবলমাত্র সুরও তাদের কাছে উপভোগের বস্তু হয়ে ধরা দেয়! চৌরাশিয়া বা বারী সিদ্দিকীর বাঁশি, বিসমিল্লাহ খাঁ'র সানাই, আমাদের সুনীলচন্দ্রের বেহালা বা হাল আমলের ভেনিসিয়া মাই-এর বেহালা, শাস্ত্রীয়-সংগীত বা রবীন্দ্র-সংগীত, লালনের গান বা নজরুলের গান, অথবা আধুনিক গান— সবকিছুই ভালোবাসেন এরা। এই যে বিভিন্ন ধরনের শ্রোতা, এদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছেন যাদের গান ছাড়া দিনই চলেই না! মনে হয়, দৈনন্দিন খাদ্যগ্রহণ ছাড়া যেমন মানুষ বাঁচে না, তেমনি এরা যেন গান ছাড়া বাঁচবেনই না! এই মানুষগুলো গানের কাছে কী পান? আশ্রয় পান, সন্দেহ নেই! পান বিনোদনও। আর কিছু? হ্যাঁ, হয়তো আরো কিছু পান। সুরের বিমূর্ত শক্তি তাদের হৃদয়ে জ্বেলে দেয় এক আশ্চর্য হীরন্ময় প্রদীপ!

আশ্রয় দেয়ার এই কাজটি কবিতাও খুব পারঙ্গমতার সঙ্গে করতে সক্ষম হয়। কবিতার যারা পাঠক, তারা কোনো-কোনো কবিতা পড়তে পড়তে মুখস্থ করে ফেলেন। কোনো বৈষয়িক প্রয়োজন ছাড়া একটি কবিতাকে মুখস্থ করার জন্য যে বিপুল ভালোবাসার প্রয়োজন হয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেকে আবার মুখস্থ না করলেও কোনো-কোনো কবিতা হাজারবার পড়ে ফেলেন। কেন এমনটি করেন তারা? একজন পাঠক কেন এক বা একাধিক কবিতার কাছে বারবার ফিরে যান? কী পান তারা কবিতার মধ্যে? কবিতার মতো প্রায় বিমূর্ত একটি শিল্পমাধ্যমের কাছে বৈষয়িক কোনো লাভের জন্য নিশ্চয়ই কেউ যান না, এমনকি দৈনন্দিন জীবনের নানা উটকো ঝামেলা বা সংকট থেকে উত্তরণের কোনো পথও দেখাতে পারে না কবিতা। যদি বলি বিনোদনের জন্যই কবিতা পড়েন পাঠকরা, তবু প্রশ্ন উঠবে একজন কবিতা-পাঠক তার চারপাশে বিনোদনের নানাবিধ রঙিন উপকরণ বাদ দিয়ে কবিতার কাছে যান কেন? যান, কারণ তার মানসগঠন আলাদা, অ-পাঠকরা যা কিছুতে আনন্দ-বিনোদন পান, তিনি/তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে পান না। তাকে আশ্রয় ও আনন্দ, বিনোদন কিংবা শান্তি দিতে পারে উচ্চতর কিছু। হয়তো কবিতাই সেই উচ্চতর মাধ্যম।

সংগীত এবং কবিতা এমন বিমূর্ত শিল্পমাধ্যম যে এগুলোকে উপভোগ করতে হলে শ্রোতা/পাঠককে প্রস্তুত হতে হয়। এই প্রস্তুতি আবার এমনিতে হয় না, শ্রবণ এবং পাঠই তাকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে তোলে। তার মানসিক কাঠামোকে সূক্ষতার উচ্চস্তরে নিয়ে যায়, মনকে করে তোলে সংবেদনশীল। এইসব শিল্পমাধ্যম এভাবেই শ্রোতা-পাঠকের মনকে গড়ে দেয়। কবিতার পাঠকদের মনের গড়ন, তাই, যারা পড়েন না তাদের থেকে আলাদা। সংগীতভোক্তাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

অবশ্য এগুলো কবিতা ও সঙ্গীতের উচ্চতর ব্যবহারিক প্রয়োগ। এ দুটোরই কিছু তাৎক্ষণিক প্রয়োগ রয়েছে। দেখা গেছে, আন্দোলন-সংগ্রাম-যুদ্ধ ইত্যাদিতে এই দুটো শিল্পমাধ্যমই খুব ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত গানগুলো অবশ্যই যোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত করেছে। শুধু মুক্তিযুদ্ধই নয়, ইতিহাসের নানা পর্বে, যেখানে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-বিদ্রোহ হয়েছে সেখানেই গণসংগীত বিদ্রোহীদের সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছে। গত শতকের আশির দশকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে কবিতাও খুব উচ্চকিত ভূমিকা পালন করেছে। যদিও এমন একটি অভিযোগ শোনা যায় যে, ওই উচ্চকিত কবিতা শেষ পর্যন্ত আর কবিতা হয়ে ওঠেনি, হয়েছে শ্লোগান। এই অভিযোগ মেনে নিলেও কবিতার এই তাৎক্ষণিক প্রায়োগিক দিকটি অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এ-ও সত্য যে, এসবই নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী প্রয়োগ। কবিতা ও সংগীতের শক্তি অন্য জায়গায়। মানুষের একান্ত মুহূর্তের সঙ্গী এরা, নিঃসঙ্গতা ও নির্জনতার সঙ্গী, নৈঃশব্দ্য ও নীরবতার সঙ্গী। গভীর উপলব্ধি ও প্রেমময়তার সঙ্গে এদেরকে গ্রহণ করতে হয় এবং করা হয়ে থাকে। আর তাই দেখা যায়, দিনের বেলায় ব্যান্ড-সংগীতের কনসার্টে উদ্দাম শ্রোতাটিও গভীর রাতে বাসায় ফিরে ওই গান আর শোনেন না, শোনেন বাণীপ্রধান-সুরপ্রধান মেলোডিয়াস গান। একইভাবে, কবিতাও ঠিক আনুষ্ঠানিক বিষয় নয়। যদিও নানা ধরনের অনুষ্ঠানে কবিতা পড়া হয়ে থাকে, আবৃত্তিকাররা খুব মমতা দিয়ে একটি কবিতাকে দর্শক-শ্রোতাদের সামনে হাজির করেন, তবু এ যেন অনুষ্ঠানের চেয়ে পাঠকের একান্ত নির্জন মুহূর্তের সঙ্গী হিসেবেই অধিকতর বেশি ও কার্যকরীভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বহু মানুষের ভিড়ে বোধহয় কবিতা তার অবর্ণনীয় রূপটি নিয়ে ধরা দেয় না!

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়লো— জাতীয় কবিতা উৎসবের প্রাঙ্গণে বসেই পটুয়া কামরুল হাসান তাঁর জীবনের শেষ ছবিটি এঁকেছিলেন। তৎকালীন শাসকের ছবি এঁকে নাম দিয়েছিলেন বিশ্ববেহায়া! এই 'বিশ্ববেহায়া' শিরোনাম সম্বলিত ছবিটি তখন সারাদেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের সময় আঁকা কামরুল হাসানের আরেকটি ছবির কথাও মনে পড়বে আমাদের। ইয়াহিয়া খানের ছবি এঁকে ক্যাপশন দিয়েছিলেন— এই জানোয়ারদের হত্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে হবে! একটি স্বয়ংক্রিয় মেশিনগানের চেয়ে এই ছবির প্রভাব কম মারাত্মক ছিলো না! এ কথা মানতেই হয়, চিত্রকলার তেমন কোনো প্রায়োগিক দিক নেই, অধিকাংশ মানুষই চিত্রকলার ব্যাপারটা বোঝেন না। কিন্তু এসব উদাহরণ মনে করিয়ে দেয়, চিত্রকলারও আছে প্রতিরোধের শক্তি! তবে, এ-ও মনে রাখতে হয়— এসবই ব্যতিক্রমী উদাহরণ। প্রকৃতপক্ষে চিত্রকলা প্রধানত বিমূর্ত শিল্পমাধ্যম, দৈনন্দিন জীবনে এর কোনো বৈষয়িক প্রভাব নেই। আছে কেবল রঙ ও রেখার সমন্বয়ে গড়ে তোলা এক আশ্চর্য সুন্দরের সামনে দাঁড়ানোর অনির্বচনীয় অনুভূতি। সেজন্যই কী বৈষয়িক লাভালাভের সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও, এমনকি গান বা কবিতা উপভোগের মতো আনন্দ পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও কিছু মানুষ এর জন্য জীবনপাত করেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন। আর কঠিন হবেই বা না কেন, কাউকে তো কোনোদিন এই কথাটি জিজ্ঞেসই করা হয়নি!

৩

সংগীত-চিত্রকলা বা কবিতার মতো গল্প-উপন্যাস ততোটা বিমূর্ত শিল্পমাধ্যম নয়। একটি কবিতার রসাস্বাদন করতে হলে অনুভূতির যে সূক্ষতা এবং চেতনাজগতের যে তীব্র সংবেদনশীলতার প্রয়োজন হয়, উপন্যাস বা গল্পের ক্ষেত্রে তা হয় না। উপন্যাসের কথাই ধরা যাক। এ পর্যন্ত যতোগুলো ফর্মে উপন্যাস লেখা হয়েছে তাতে দেখা যায়, সাধারণত একটি ঘটনাপ্রবাহের ভিতর দিয়ে ঔপন্যাসিক তার পাঠককে এগিয়ে নিয়ে যান। চরিত্রগুলোর সক্রিয়তা, ভাবনাজগৎ, পাস্পরিক সম্পর্ক, সম্পর্কের ধরনধারণ-উত্থানপতন এসবই পাঠককে প্রস্তুত করে তোলে আখ্যানের চলমানতা ও জটিলতার ভিতর দিয়ে জীবনসত্যের উন্মোচনের জন্য।

একটি ভালো উপন্যাস পাঠের অভিজ্ঞতা একজন মানুষকে আমূল বদলে দিতে পারে। উপন্যাস, এমনকি উপন্যাসের একটি বাক্য কিভাবে মানুষকে পাল্টে দেয়, তার একটি উদাহরণ দেয়া যাক। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন কবি জয় গোস্বামী। শুরুতেই সন্দীপনের একটি উপন্যাসের ভূমিকার কয়েকটি লাইন পড়ে শুনিয়েছিলেন তিনি, তারপর অদ্ভুত একটি মন্তব্য করেছিলেন। যে অংশটুকু জয় গোস্বামী পড়েছিলেন পাঠকদের সুবিধার্থে সেটি তুলে দিচ্ছি :

> 'আমার সব রচনাই আত্মজৈবনিক। শুধু এই একটি ছাড়া। মৃত মানুষদের নিয়ে লিখতে গিয়ে এই প্রথম আমাকে একটি কাল্পনিক উপন্যাস লিখতে হল। কেননা, আমি দেখলাম, মৃতের গল্প কোনো জীবিত মানুষের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। তা যদি হত, তাহলে জীবিতের ত্বক মৃতের চামড়া গ্রহণ করত। কিন্তু, না, জীবিতের শোক মৃত গ্রহণ করে না। আমরা এদিক থেকে বড় পরাধীনভাবে বেঁচে আছি। তাই, এই প্রথম আমার একটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক উপন্যাস, যার সব চরিত্রই কল্পনাপ্রসূত।'...
>
> এইটুক উল্লেখ করে জয় বলছেন :
>
> 'ধরুন, *আমরা এদিক থেকে বড় পরাধীনভাবে বেঁচে আছি* বা এই যে *জীবিতের শোক*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত গ্রহণ করে না এই ধরনের একটা বাক্য পড়বার পরে ভিতরটা একদম— মানে— বাক্যটা পড়বার আগ পর্যন্ত— যে ভাবে বেঁচে ছিলাম, সেই বেঁচে থাকাটা যেন পাল্টে যায়।'

উপন্যাসের 'ভূমিকা'র একটি বাক্য একজন কবিরও বেঁচে থাকাটা পাল্টে দেয়! হ্যাঁ, দেয়। উপন্যাসের আসল শক্তিটা ওখানেই। ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের ক্ষেত্রেও এরকম ঘটনা ঘটেছিল। সেই সুদূর কৈশোরে কোনো এক অজানা কারণে 'পথের পাঁচালি' পড়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলাম আমি। অজানা কারণে বলছি এই জন্যে যে, তখন পর্যন্ত আমার বই পড়ার দৌড় রূপকথা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো; বড়োজোর স্কুলের পাঠ্যবইতে দু-একটা গল্প পড়ে থাকবো। কেউ আমাকে 'পথের পাঁচালি'র কথা তখন পর্যন্ত বলেওনি। তবু এরকম তীব্র ইচ্ছে জাগার কারণ হলো– স্কুলের পাশে একটা বইয়ের দোকানে ওই বইটি ডিসপ্লে করা থাকতো। পেপারব্যাক সংস্করণে বেশ মোটাসোটা একটা বই; সাদাকালো প্রচ্ছদে গ্রামের পথে একজোড়া কিশোর-কিশোরী। হয়তো ওই সাদামাটা প্রচ্ছদটিই আমাকে আকৃষ্ট করে থাকবে। নিজের ফেলে আসা গ্রাম, গ্রামের মেঠোপথ, ভাইবোনের স্মৃতি ইত্যাদির কল্পনা হয়তো জেগে উঠতো প্রচ্ছদটি দেখে। বহু কষ্ট করে, টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে একদিন ওই বইটি কিনেও ফেললাম, আর গ্রোগ্রাসে গিলে ফেললাম কয়েকদিনের মধ্যেই। আমার সেই বয়সটি মোটেই 'পথের পাঁচালি' পড়ার বয়স ছিলো না (ক্লাস সেভেনে পড়ি কেবল), তবু কি এক অমোঘ আকর্ষণে বইয়ের প্রতিটি পাতা আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল পরের পাতায়। বইটি পড়ে উঠবার পর টের পেলাম— আমার আর রূপকথা পড়তে ভালো লাগছে না, 'ছোটদের বই'ও ভালো লাগছে না। ইচ্ছে করছে 'পথের পাঁচালি'র মতো বই পড়তে। ওই একটি বই আমার জীবনটিকেই ভিন্ন এক খাতে বইয়ে দেয়। বইয়ের জগৎ হয়ে ওঠে আমার অতিপ্রিয় স্বপ্নের জগৎ। কিশোরদের স্বাভাবিক কাজকর্মগুলোর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি আমি, হয়ে পড়ি ঘরবন্দী। শুধু ওই কৈশোরেই নয়, এরপরও আরো বহুবার আমি টের পেয়েছি— একটি উপন্যাস পড়ার আগে আমি যেমন মানুষ ছিলাম, পড়ার পর আর তেমনটি থাকি না। মানুষ হিসেবেই বদলে যাই আমি। একটি ভালো উপন্যাস এই কাজটি খুব পারঙ্গমতার সঙ্গে করতে পারে। মনের গড়ন ঠিক করে দেয় একটি উপন্যাস। একই কথা হয়তো অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও খাটে। একটি কবিতা পড়ার আগের মানুষটি, কবিতাটি পড়ার পর আর আগের মানুষ থাকেন না। একটা গানও তেমন প্রভাব ফেলতে পারে। তবে উপন্যাসই এই ক্ষেত্রে সবেচেয়ে বেশি প্রভাবশালী। একটি আখ্যান-বর্ণনার ভিতর দিয়ে এগোয় বলে, উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে পাঠকের কাছে চেনা মনে হয় বলে একটি উপন্যাস পাঠককে তার নিজের সঙ্গে অনেক বেশি সংলগ্ন করে ফেলে। নিজের অজান্তেই পাঠক ওই উপন্যাসের অংশ হয়ে যায়, চরিত্রগুলোর ভাবনাজগৎ বুঝতে গিয়ে সে-ও একইরকমভাবে ভাবতে শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে; আর তাই, পাঠশেষে সে আবিষ্কার করে— সে আর আগের মানুষটি নেই, অন্যরকম হয়ে গেছে!

৪

সংগীত, সাহিত্য বা চিত্রকলার মতো চলচ্চিত্র বা নাটক বিমূর্ত শিল্পমাধ্যম নয়। পূর্বোক্ত শিল্পগুলো উপভোগের জন্য হৃদয় ও মস্তিষ্কের যতোখানি সক্রিয়তা প্রয়োজন, চলচ্চিত্র বা নাটক উপভোগের জন্য ততোখানি প্রয়োজন হয় না। বরং এগুলোতে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার একটা ব্যাপার থাকে। মঞ্চনাটক তো রীতিমতো জীবন্ত শিল্পমাধ্যম। দর্শকদের সামনেই সেগুলো অভিনীত হয়, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াও পাওয়া যায়। মঞ্চনাটক এতখানি জীবন্ত বলেই এটিকে সবসময় সমসাময়িক থাকতে হয়; সমকালের দর্শকদের জন্য উপযোগী করে নাট্যভাষ্যও তৈরি করে নিতে হয়। এদিক থেকে দেখতে গেলে সমকালের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং কার্যকরী শিল্পমাধ্যম আসলে মঞ্চনাটকই। তবে এর কিছু অসুবিধাজনক দিকও আছে। যেমন, কোনো একটি নাটকের প্রদর্শনী কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে ওই নাটক নিয়ে কথা বলার জন্য স্মৃতির ওপর নির্ভর করা ছাড়া দর্শকদের আর কিছুই করার থাকে না। এমনকি একই নাটকের পরপর দুটো প্রদর্শনীও একইরকম না-ও হতে পারে। মঞ্চনাটক সেই অর্থে সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় এবং পরিবর্তনশীল শিল্পমাধ্যম। এবং একই সঙ্গে ক্ষণস্থায়ীও। কারণ এর কোনো স্থায়ী রূপ নেই, একে ধরে রাখবারও কোনো ব্যবস্থা নেই। সেদিক থেকে চলচ্চিত্র খানিকটা এগিয়ে আছে। অনেক আগের দেখা কোনো একটি চলচ্চিত্র হয়তো আপনার মনে দাগ কেটেছিল, মন চাইলে অনেকদিন পর আবার সেটিকে ফিরে দেখতে পারেন আপনি। প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি চলচ্চিত্রশিল্পের এই উপকারটুকু করেছে যে, দীর্ঘকাল পরেও একটি ছবি দর্শকরা দেখে নিতে পারে। এই দুই শিল্পমাধ্যমই মূর্ত হয়ে দর্শকদের সামনে হাজির হয় বলে সংগীত ও সাহিত্যের মতো এর প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম দীর্ঘস্থায়ী। এবং খেয়াল করলে দেখা যাবে— শিল্প যতো বেশি মূর্ত ততো বেশি ভোক্তা, বিমূর্ত শিল্পের ভোক্তা কম, এবং খানিকটা জনবিচ্ছিন্নও বলা যায়! তবে তুলনামূলকভাবে কম জনপ্রিয় হলেও বিমূর্ত শিল্পের প্রভাব দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকে, অন্যদিকে মূর্ত শিল্পের প্রভাব খুব স্বল্পস্থায়ী।

শিল্পের এই যে গ্রহণযোগ্যতা এবং উপভোগ্যতা, তার ফলাফল কি? তাৎক্ষণিক কোনো ফল কী দেখতে পাওয়া যায়? ধরা যাক, একটি গল্পে বা উপন্যাসে একজন লেখক নানাবিধ কাহিনী রচনা করে শেষে এসে একটি রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়ে দিলেন। তাহলে কি ওই গল্প বা উপন্যাসের পাঠকরা বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়বেন? মনে হয় না। অন্তত আজ পর্যন্ত তেমন কোনো উদাহরণ আমরা দেখিনি। বরং ঘটে উল্টোটাই। পাঠকরা বইয়ের পাতায় বিপ্লব ঘটে যেতে দেখে সুখ বোধ করেন, কারণ এ ব্যাপারে তার আর কোনো দায়দায়িত্ব রইলো না। যা করার তা লেখক তার সৃষ্ট চরিত্রগুলো দিয়েই করিয়ে নিয়েছেন। একইভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি বিপ্লবী কবিতা বা গান পড়ে বা শুনে একজন পাঠক বা শ্রোতা বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হবেন, এটা ভাবা বোকামি। তেমন কিছু ঘটতে দেখা যায় না কখনো। তবে বিপ্লব-বিদ্রোহ-সংগ্রাম-আন্দোলনে এসব গান-কবিতার বিশেষ ভূমিকা থাকে– সেকথা আগেই বলেছি। বিপ্লবীদের উজ্জীবিত করতে এগুলোর জুড়ি নেই। আমাদের মুক্তিযুদ্ধকালীন গান-কবিতা তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ। কিন্তু এগুলো বিচ্ছিন্ন উদাহরণ। কোনো জাতি বা কোনো মানুষ সারাজীবন ধরেই বিপ্লব-বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে যায় না। তার বা তাদের জীবনে স্থির সময় আসে, অবসর আসে, নৈঃশব্দ্য ও নিঃসঙ্গতা আসে। এই মুহূর্তগুলোতে নিশ্চয়ই কেউ বসে বসে বিপ্লবের গান শোনেন না বা বিপ্লবী কবিতা-গল্প পড়েন না। বরং এইসব মুহূর্তে তাকে আশ্রয়, আনন্দ ও নির্ভরতা দিতে পারে যে শিল্প, তাকেই আমি শুদ্ধশিল্প বলে মনে করি।

৫

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শিল্পের দার্শনিক গুরুত্বও অপরিমেয়। শিল্প যখন সফল হয়ে ওঠে, তা সে যে ধরনের শিল্পই হোক না কেন, তার মধ্যে আপনি একটি দর্শন খুঁজে পাবেন। একটি সফল কবিতা বা গল্প বা উপন্যাস বা নাটক বা চলচ্চিত্র বা চিত্রকলা বা সংগীত ভোক্তার মনে এক দার্শনিক উপলব্ধির জন্ম দেয়। সেই অর্থে শিল্প নিজেই দর্শনকে ধারণ করে রাখে। শিল্পীরা ভিন্ন ভিন্ন শিল্পমাধ্যম বেছে নেন কেন সেটাও একটা প্রশ্ন হতে পারে, এ প্রসঙ্গে। এটা বোধহয় স্বাচ্ছন্দ্যবোধের ব্যাপার। কেউ সাহিত্যে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, কেউ বা চলচ্চিত্রে, কেউ সংগীতে করেন তো কেউ চিত্রকলায়। তবে, মূল বিষয়টি হচ্ছে— এই শিল্পীরা তাঁদের কাজের মাধ্যমগুলো দিয়ে কারো-না-কারো সঙ্গে কমিউনিকেট করতে চান, এবং তার দর্শনটি ভোক্তার কাছে পৌঁছে দিতে চান। মাধ্যমগুলো আসলে তাঁদের যোগাযোগের ভাষা। আমরা কবিতার ভাষা নিয়ে কথা বলি, কথাসাহিত্যের ভাষা নিয়ে কথা বলি, চলচ্চিত্রের ভাষা নিয়ে কথা বলি, কিন্তু একটি বিশেষ ব্যাপার ভুলে যাই যে, এই মাধ্যমগুলো প্রত্যেকটিই একেকটি ভাষা হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ কবিতা নিজেই একটি ভাষা, কবি সেটিকে ব্যবহার করেন তাঁর পাঠককে কমিউনিকেট করার জন্য। চলচ্চিত্র বা চিত্রকলাও তাই। সংগীত অনেক বেশি বিমূর্ত মাধ্যম হলেও এটিই সবচেয়ে শক্তিশালী ভাষা। আর সেজন্যই, যে ভাষায়ই রচিত হোক না কেন, সংগীতের সুর যে-কোনো দেশে যে-কোনো কালে যে-কোনো মানুষকে স্পর্শ করে। সেই অর্থে সংগীতই সবচেয়ে বেশি দেশকাল-নিরপেক্ষ শিল্পমাধ্যম হয়ে উঠতে পেরেছে। আর এরকম দেশকাল-নিরপেক্ষ শিল্পের জন্ম দেয়াই শিল্পীর চূড়ান্ততম দায়।

৬

শিল্পীদের সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে অনেক কথা বলা হয়! শিল্পীরা 'শিল্পের জন্য শিল্প' করবেন নাকি 'জীবনের জন্য শিল্প' করবেন এ নিয়ে বিতর্ক বহু পুরনো। কূটতর্ক, বলাইবাহুল্য। সব শিল্পই জীবনের জন্য, আবার সব শিল্প শিল্পের জন্যও বটে। শিল্প যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের জন্য না-ই হবে তাহলে সেটি কার জন্য? মরণের জন্য? নাকি মানুষ ব্যতিত অন্য কোনো প্রাণীর জন্য, যাদের জীবনকে আমরা 'জীবন' বলেই মনে করি না? অন্য কোনো প্রাণী মানুষের সৃষ্ট শিল্প উপভোগ করে বলে তো মনে হয় না! নাকি ভিন গ্রহের কারো জন্য? এই ধরনের ফালতু কথা বলার কোনো মানেই নেই আসলে। শিল্পকে সবার আগে শিল্প হয়ে উঠতে হবে, শিল্পীর দায় হলো শিল্পকে আগে শিল্প করে তোলা— সেটা 'জীবনের' জন্যই হোক, আর 'শিল্পের' জন্যই হোক। এই দুটো ধারার সৃষ্টি হয়েছে আসলে দুটো চরমপন্থী চিন্তাবিদ দলের দ্বারা। একদল মনে করেন, শিল্পকে হতে হবে মানুষের জন্য। এর মাধ্যমে তাঁরা বোঝাতে চান যে, একজন শিল্পীর কাছে শিল্পের প্রয়োজনের চেয়ে মানুষের প্রয়োজনই বড়ো হওয়া উচিত, মানুষের যে বৈষয়িক সমস্যা-সংকট-বিপর্যয় আছে সেগুলোই শিল্পের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত। এই চিন্তার চূড়ান্ত ধরন হলো— শিল্পকে বিপ্লবের উপাদান হয়ে উঠতে হবে। আর এই ধরনের এক্সট্রিম চিন্তার প্রতিক্রিয়া হলো— 'শিল্পের জন্য শিল্প' মতবাদ। এই মতবাদীরা বলতে চাইলেন, শিল্পীর আর কোনোদিকে তাকানোর দরকার নেই, কেবল শিল্প নিয়ে থাকলেই চলে। এই দুটোকেই চরমপন্থী মতবাদ বলে মনে করি আমি। শিল্পী কোনো সমাজ-বিচ্ছিন্ন জীব নন, যে, তিনি কেবল শিল্প নিয়েই থাকবেন; মানুষ-সমাজ-রাষ্ট্র এসবের প্রতি তাঁর কোনো দায় থাকবে না। আবার শিল্পী কোনো বিপ্লবীও নন। তাঁর কাছ থেকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড বা সৃষ্টিকর্ম আশা করাও ঠিক নয়। শিল্প শেষ পর্যন্ত বিপ্লব করতে পারে না, এটা এখন প্রমাণিত সত্য। কোনো তাৎক্ষণিক অভিঘাত সৃষ্টি করাও শিল্পের পক্ষে সম্ভব নয়। যা পারে তা হলো, শিল্প— খুব ধীরে, হয়তো শত বছর ধরে— একটি জনগোষ্ঠীর মনে একটু একটু করে পরিবর্তন আনতে পারে। শিল্প মানুষকে আশ্রয় দেয়, প্রেরণা দেয়, উচ্চস্তরের বিনোদন দেয়, মানুষের মনের আকার দেয়; কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি ধীর গতিতে ঘটে। চটকদার ভঙ্গিতে কথা বলে বিপ্লবী ভাবমূর্তি নির্মাণের চেষ্টা কেউ কেউ করে থাকেন বটে, আবার কেউ কেউ বালির মধ্যে মুখ গুঁজে ঝড়ের দাপট এড়াতে চান বটে— এই দুই ধরনের শিল্পীই শেষ পর্যন্ত শিল্পের জন্য ক্ষতিকর।

সত্যি কথা বলতে কি, দায়বোধ ছাড়া শিল্পীই হওয়া যায় না। শিল্পী মাত্রই মানুষকেন্দ্রিক-সমাজকেন্দ্রিক-সময়কেন্দ্রিক ব্যক্তি। কেউ তার নানাবিধ সক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে এসবের প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটান, কেউ ঘটান না— পার্থক্য এটুকুই। যিনি প্রকাশ করেন না, এটা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এ জন্য তাকে দায়ী করা যাবে না। ঘটান না বলে যে তিনি সঙ্গে থাকেন না, তা তো নয়! এত যে নির্জন কবি জীবনানন্দ দাশ, তাঁর কবিতায়ও কী সময়ের চিহ্ন ধরা নেই? দেশ-সমাজ-মানুষ নেই? ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা নেই?

অবশ্য বাংলাদেশের মতো পোড়া দেশে শিল্পীর আরো কিছু দায় আছে— মানুষের সঙ্গে থাকা, সময়ের সঙ্গে থাকা, প্রয়োজনে জনমানুষের ডাকে সাড়া দেয়া ইত্যাদি। শিল্পের দায় আর প্রয়োজনের দায়— এ দুয়ের সমন্বয় যারা ঘটাতে পারেন, তারাই বড়ো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পী, মহান শিল্পী। তবে কেউ যদি এগুলো না করে, কেবল শুদ্ধশিল্প রচনার দায়িত্বে মগ্ন থাকেন, তবু তাকে এতটুকু ছোট ভাববার উপায় নেই। তিনি তার কাজটিই করে যাচ্ছেন। মহাকাল একমাত্র শিল্পকেই বাঁচিয়ে রাখে, শিল্পসৃষ্টিই মহত্তম কাজ। তাৎক্ষণিক কাজে না লাগুক— বহুদূরের, বহুকাল পরের পাঠক-দর্শক-শ্রোতা অর্থাৎ শিল্পভোক্তারা তাদের জীবনের গড়ন দেবেন এসব শিল্প দিয়ে! কাজটি কি কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ?

শিল্পীর মূল দায়, তাই, শিল্পকে শিল্প করে তোলা, তার আর কোনো কাজ নেই। শিল্প তাৎক্ষণিকভাবে সমাজ পরিবর্তন করতে পারে না, এটা প্রমাণিত সত্য। যা করতে পারে তা হলো— প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের কিছু মানুষের মনের গড়ন দিতে; মানুষকে করে তুলতে পারে সংবেদনশীল। একজন শিশু-কিশোরের মন কাদামাটির মতো নরম এবং আকারবিহীন থাকে। ধীরে ধীরে নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা সেই মনের আকার দেয়। শুদ্ধশিল্পের ভোক্তা যদি হয়ে ওঠে সে, তাহলে তার মনটি সেভাবেই আকার পাবে। আর শৈল্পিক মনের এই সংবেদনশীল মানুষগুলোই সমাজে পরিবর্তন আনে। সুতরাং, শিল্প সমাজ পরিবর্তন করে বটে, তবে, পরোক্ষভাবে, দীর্ঘসময় ধরে; প্রত্যক্ষভাবে নয়, তাৎক্ষণিকভাবে তো নয়ই! আজকের যে পৃথিবী তা শিল্পেরই পৃথিবী! যদি শিল্পের জন্ম না হতো পৃথিবীতে, তাহলে মানবজাতি তার আদিম অবস্থা থেকে বেরুতেই পারতো না। তবে শিল্পের এই ভুবনবিস্তারি কাজটি সাধিত হয়েছে খুব ধীরলয়ে, দীর্ঘসময় ধরে। এতটাই ধীরে যে, আমরা সবসময় তা অনুভবও করে উঠতে পারি না।

[রচনাকাল : জুলাই-আগস্ট, ২০০৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় পর্ব

বাংলাদেশ : সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি

রাজনীতির দর্শন ও কর্মসূচি

বাঙালির সংস্কৃতিচিন্তা

ইতিহাসের বিকৃতি, ইতিহাসের কারচুপি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতির দর্শন ও কর্মসূচি

আমাদের দেশে অহরহ রাজনৈতিক দল ভাঙে, নতুন দল গড়ে ওঠে, 'বড় দলের ছোট নেতা'রা 'ছোট দলের বড় নেতা' হয়ে ওঠেন। কিছুদিন তাদের উচ্চকণ্ঠ শোনা যায়, খবরের কাগজ ও টেলিভিশনের পর্দায় তাদের সরব উপস্থিতি দেখা যায়। মিডিয়াগুলো যে তাদের প্রতি আগ্রহ দেখায় বা তাদের কথা সাড়ম্বরে প্রচার করে সেটা যতোটা না নতুন দলের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য, তারচেয়ে বেশি পুরনো দলগুলোর ভিতরকার খবর বের করে আনার জন্য। এই নেতারা তা বোঝেন না, তারা মনে করেন—জনগণের কাছে বিপুল গ্রহণযোগ্যতার কারণেই সাংবাদিকরা তাদের পেছনে ছুটতে বাধ্য হচ্ছেন! উত্তেজনার বশে, প্রবল বিক্রমে, তারা সদ্য ছেড়ে আসা দল ও নেতৃত্বের প্রতি বিষোদগার করেন। তাদের কমনসেন্স লুপ্ত হয়, ভুলেই যান যে— 'এই দলটি যদি এতই খারাপ হয়ে থাকে, তাহলে এর সঙ্গে আপনি এতদিন ছিলেন কেন এবং কীভাবে'—প্রশ্নটি করলে তিনি বা তারা কী উত্তর দেবেন! তারা আসলে সংবাদকর্মীদের কৌশলী ফাঁদে পা দেন। সাংবাদিকরা তাদের মুখ থেকে পুরনো দলের যাবতীয় দুষ্কর্ম ও নীতিহীনতা এবং বর্বর কার্যকলাপের বিবরণ তুলে এনে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেন—এই লোকটিও এতদিন এইসবকিছুর সঙ্গেই ছিলেন! নতুন দলের নীতি-আদর্শ-কর্মসূচি নিয়ে কথা বলার সুযোগ তাদের খুব একটা হয়ে ওঠে না—প্রকৃতপক্ষে তাদের কোনো নীতি-আদর্শ-কর্মসূচি থাকেও না। যা নেই তা নিয়ে তারা কথা বলবেন কীভাবে? ফলে কিছুদিনের মধ্যেই এসব দলের মৃত্যু ঘটে। যেহেতু নেতাকেন্দ্রিক দল, দলকেন্দ্রিক নেতা নয়—অতএব দলের মৃত্যু ঘটলেও নেতার মৃত্যু ঘটে না। তারা রয়ে যান—সুযোগ খোঁজেন পুরনো দলে ফিরে যাবার অথবা নতুন কোনো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার।

এই প্রক্রিয়া চলছে দীর্ঘদিন ধরে। যেন এই অনিবার্যতা থেকে আমাদের মুক্তি নেই। কিন্তু কেন এরকম ঘটে? কেন অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের কোনো দর্শন-আদর্শ-কর্মসূচি থাকে না? একটি রাজনৈতিক দলের— যে দর্শন থাকার কোনো বিকল্প নেই সেকথা কি তারা বোঝেন না? নাকি বুঝলেও একটি দর্শনের জন্ম দিতে, কিংবা পুরনো দর্শনেরই একটি চলনসই নতুন রূপ দিতে তারা অক্ষম? যদি তা-ই হয়ে থাকে তাহলে তো রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতাই তাদের নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

পৃথিবীর সব দেশেই শক্তিশালী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান ভিত্তি তাদের দর্শন। দ্বিতীয় ভিত্তি— কর্মসূচি। বাংলাদেশের প্রধান দুটো দলের কথা বিবেচনা করলেও এর সত্যতা মিলবে। বিচার করা যেতে পারে অন্য কয়েকটি ছোটখাটো দলের কথাও— তাতে রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মসূচির গুরুত্ব বোঝা যাবে। বাংলাদেশের প্রধান দুটো দল— আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র প্রথম থেকেই দর্শন এবং কর্মসূচি ছিলো এবং এখনো আছে। আওয়ামী লীগের কথাই ধরা যাক। 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে কিছুকালের মধ্যেই নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে এই দলটি অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষে তাদের আদর্শিক-দার্শনিক অবস্থান পরিষ্কার করেছিল। পাকিস্তান আমলে, যখন সবকিছুতে 'ইসলাম', 'মুসলিম' ইত্যাদি শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার চলছে, তখন দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়াটাই ছিলো এক দুর্দান্ত সাহসী ও প্রগতিশীল সিদ্ধান্ত। সেই থেকে শুরু করে দলটি নিজেদেরকে অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক আদর্শের পক্ষের শক্তি বলে প্রমাণ করতে চেয়েছে ও পেরেছে। অবশ্য শুধু দর্শন বা আদর্শের বুলি কপচানোতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি তাদের কর্মকাণ্ড। জনগণের আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করে, তাদের আবেগ-অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করে নিয়মিতভাবে কর্মসূচি নির্ধারণ করে গেছে তারা। পাকিস্তানি অপশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামে তাদের ভূমিকা ছিলো বরাবরই জনগণের পক্ষে। এই আন্দোলন-সংগ্রামকে একটি পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার ব্যাপারেও তাদের আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি ছিলো না। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান আর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ প্রধানত তাদেরই সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির ফলাফল। একটি কথা বলে নেয়া ভালো— মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী আর মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী আওয়ামী লীগ দার্শনিকভাবে এক নয়। পাকিস্তান আমলে আওয়ামী লীগ একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যস্থা প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন করলেও এবং জাতীয়তাবাদী চেতনাকে লালন করে একে বিকশিত রূপ দেয়ার চেষ্টা করলেও তাদের দর্শনের মধ্যে সমাজতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো স্থান ছিলো না। আওয়ামী লীগ দলগতভাবে এবং এর শীর্ষ নেতৃত্ব ব্যক্তিগতভাবে কখনোই সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেননি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়ার মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা দেবার মানসিকতা থেকে আওয়ামী লীগ দার্শনিকভাবে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে চলে আসে, এবং রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে এগুলোকে গ্রহণ করা হয়। দলের মূলনীতিতেও এগুলোই স্থান পায়। বলা প্রয়োজন, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি এবং দলীয় মূলনীতি এক না-ও হতে পারে, রাষ্ট্র পরিচালনায় তাতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। যেমন, ভারতের রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সঙ্গে বিজেপির দলীয় মূলনীতির বড় ধরনের বিরোধ রয়েছে। তারা ক্ষমতায় গিয়েও রাষ্ট্রীয় বা দলীয় মূলনীতির কোনোটিতেই পরিবর্তন না এনেই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে। তবে আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে যে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও দলীয় মূলনীতি মিলেমিশে গেলো তার কারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযুদ্ধ। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত উপলব্ধি তাজউদ্দিন আহমদকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম বেতার ভাষণে (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে এবং তাঁর সঙ্গে কোনো রকম পরামর্শ ছাড়াই) ওগুলোকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করতে উদ্বুদ্ধ করে। তবে দলীয় মূলনীতি হিসেবে এগুলোকে গ্রহণ করা হবে কিনা, সে সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেননি। বঙ্গবন্ধু ফিরে আসার পর এগুলোকেই দলীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বোঝা যাচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলোর দর্শন কোনো অনড় বিষয় নয়— সময়ের সঙ্গে, জনগণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এগুলোর সংযোজন-বিয়োজন ঘটতে পারে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত—এই দুই যুগের মধ্যে আওয়ামী লীগ দার্শনিকভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ দল হয়ে ওঠে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি বিষয়গুলো তাদের অলংকারে পরিণত হয়। দর্শনের নয়, বরং স্বাধীনতার পর থেকে আওয়ামী লীগের যা কিছু ব্যর্থতা সেটি প্রকৃতপক্ষে তাদের কর্মসূচির ব্যর্থতা। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তারা জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ তো হয়-ই, ব্যর্থ হয় তাদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণেও। সার্বিক পরিস্থিতি এতটাই নাজুক হয়ে ওঠে যে, জনগণ অতিদ্রুত আওয়ামী লীগ থেকে নিজেদের মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করে। শুধু তা-ই নয়, জনগণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কর্মসূচি প্রণয়নে দলটি নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়। একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো যেতে পারে। স্বাধীনতার পর খেয়ে-পরে বাঁচার নিশ্চয়তা যেমন মানুষ প্রত্যাশা করেছিল, প্রত্যাশা করেছিল আর্থিক-সামাজিক-রাজনৈতিক নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা, তেমনই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এক বিশাল যুবগোষ্ঠী নিজেদের দেশকে দেখতে চেয়েছিল একটি আত্মনির্ভরশীল ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন দেশ ও জাতি হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে থাকায় এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও দার্শনিক প্রজ্ঞার কারণে তাজউদ্দিন আহমদের পক্ষে এই বিষয়টি যতো সহজে উপলব্ধি করা সম্ভব ছিলো, বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তা ছিলো না। ফলে তাজউদ্দিন আহমদ যে-সব নীতি ঘোষণা করেন, বঙ্গবন্ধু সেগুলোর অনেককিছু থেকে সরে আসেন। যেমন, প্রথম বেতার ভাষণে তাজউদ্দিন 'দেশ গঠনে মার্কিন সহায়তা' নেয়ার প্রস্তাবে সরাসরি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যে ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালন করেছিল, তাতে স্বাধীনতার পর তাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করা ছিলো আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ বিসর্জনের সামিল। তাছাড়া বিষয়টিকে তিনি দেখেছিলেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের সুদূরপ্রসারি চক্রান্ত হিসেবে। কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের মাথায় তাজউদ্দিন ঘোষিত এই সিদ্ধান্ত স্বয়ং শেখ মুজিব পরিবর্তন করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা গ্রহণে সম্মত হন! শুধু তা-ই নয়, দিন দিন তাদের ওপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়তে থাকেন তিনি ও তাঁর সরকার। এর ফলাফল যে কী ভয়াবহ হবে তা তিনি ভাবতেও পারেননি। কিন্তু '৭৪-এ 'সাহায্য' বোঝাই জাহাজ আটকে দিয়ে, দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রেখে তারা শেখ মুজিবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই আস্থার জবাব দিয়েছিল, যা তৎকালীন সরকারের জনপ্রিয়তাকে নামিয়ে এনেছিল শূন্যের কোঠায়। আজও যে যুক্তরাষ্ট্রের থাবা থেকে নিজেদেরকে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ছে আমাদের জন্য, এমনকি বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এর মতো সর্বনাশা প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্র পরিচালনায় সরাসরি হস্তক্ষেপ করছে, তার বীজ রোপিত হয়েছিল সেই '৭২ সালেই— বঙ্গবন্ধু যেদিন তাজউদ্দিন আহমদের এই তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তটি পরিবর্তন করেছিলেন। এটি কোনো মামুলি ব্যাপার ছিলো না, বরং এর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও দার্শনিক গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। আওয়ামী লীগ অবশ্য এর পরেও অনেকবার দলীয় দর্শন-বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। '৭৪-এর একদলীয় সরকার ব্যবস্থা এবং মৌলিক অধিকার বিরোধী বহুবিধ কালাকানুন প্রণয়ন যার অন্যতম। (এর অনেকগুলোই আজ পর্যন্ত বাতিল করা হয়নি বরং সবগুলো সরকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য এগুলো ব্যবহার করেছে। নিয়তির পরিহাস এই যে, এই কালাকানুনগুলো সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ করা হয়েছে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধেই। এ যেন গিলোটিনের প্রথম শিকার স্বয়ং উদ্ভাবক নিজেই— এরকম ব্যাপার।) আরো পরে, মুক্তবাজার অর্থনীতিকে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলনীতি ঘোষণা করা ছিলো এরকম আরেকটি সিদ্ধান্ত। এটিও আওয়ামী লীগের দর্শন বিরোধী। '৯১-এর জাতীয় নির্বাচনে পরাজয়ের পর থেকে আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি থেকেও প্রকাশ্যেই সরে আসতে থাকে। ওই নির্বাচনের পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করে 'ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র নেতৃত্বে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলা হয়। সেই আন্দোলনে আওয়ামী লীগ প্রকাশ্যেই সমর্থন দেয়। নির্মূল কমিটি যেদিন গণআদালতের আয়োজন করে, সেই সভায় স্বয়ং শেখ হাসিনাও উপস্থিত ছিলেন। মজার ব্যাপার হলো, গণআদালত যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের দায়ে ফাঁসির রায় ঘোষণা করে, শেখ হাসিনা বছরখানেকের মধ্যে তাদের সঙ্গে নিয়েই সরকার বিরোধী যুগপৎ আন্দোলন শুরু করেন! স্বয়ং গোলাম আজম এই যুগপৎ আন্দোলন সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে, এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগের কাছ থেকে জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে! আহমদ ছফা একবার বলেছিলেন– 'আওয়ামী লীগ যখন জেতে তখন একা আওয়ামী লীগই জেতে, আর যখন হারে তখন সারা বাংলাদেশ হারে।' বিষয়টি আওয়ামী লীগ বোঝে কিনা, সন্দেহ জাগে। যাহোক, নীতিবিরুদ্ধভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে আঁতাত-চেষ্টার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২০০৭ সালের (বাতিল হয়ে যাওয়া) নির্বাচনের আগে চরম-সাম্প্রদায়িক একটি দলের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে। দার্শনিকভাবে কতোটা পতন ঘটলে এমনটি হওয়া সম্ভব তা ভাবা যায় না। এর কোনোটিই এই দলটির কাছে প্রত্যাশিত ছিলো না। সারাজীবন ধরে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে, জেল-জুলুম সহ্য করে, শেষ জীবনে এসে বঙ্গবন্ধু একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করবেন সেটা কি ভাবা যায়? মানুষের অধিকার নিয়ে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার কণ্ঠ ছিলেন যে শেখ মুজিব, তিনিই মানুষের মৌলিক অধিকার হরণের জন্য কালাকানুন তৈরি করবেন এটিও কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্পনা-সম্ভব বিষয়? ৬০ বছর ধরে অসাম্প্রদায়িকতার প্রতীক দলটি ক্ষমতায় যাবার জন্য একটি চরম সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে তাদের দাবি-দাওয়া বাস্তবায়নের চুক্তি করবে, তা-ও কি সম্ভব? যাহোক, অনেক প্রসঙ্গ উত্থাপন না করেও বলা যায়— কর্মসূচির ব্যর্থতার কারণেই মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়া দলটি দীর্ঘদিন বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হয়। কিন্তু সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ঐতিহ্য এবং দেশের সকল সংকটে জনগণের পাশে থাকার মাধ্যমে তারা যে আস্থা অর্জন করেছে, তার শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। আর তাই আওয়ামী লীগ-ই এখন যেমন, তেমনই আরো বহুকাল পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধানতম রাজনৈতিক দলই রয়ে যাবে।

৩

একটি দলের রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মসূচির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করার বা একে প্রত্যাখ্যান করার সম্পূর্ণ অধিকার জনগণের রয়েছে, কিন্তু দর্শন না থাকলে জনগণ সেই দলকে গ্রহণই করে না। যেমনটি ঘটেছে জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রে। নয় বছর রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকেও দলটি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। কিন্তু সে প্রসঙ্গে যাবার আগে আরেকটি প্রধান দল বিএনপি'র কথা বলে নেয়া দরকার।

'বিএনপির জন্ম হয়েছিল সামরিক শাসকের পকেট থেকে'— বিএনপি-বিরোধী বুদ্ধিজীবী-রাজনীতিবিদদের মুখে এরকম কথা প্রায়ই শোনা যায়। কথাটি মিথ্যেও নয়। কিন্তু সামরিক শাসকের পকেট থেকে জন্ম নিলে কোনো দলের রাজনীতি করার অধিকার আছে কি না, থাকলে জনগণের কাছে সেই দলটির গ্রহণযোগ্যতা পাবার সম্ভাবনা আছে কি না— এ বিষয়ে তারা কিছু বলতে চান না! বিএনপির বিরুদ্ধে এই সমালোচনা— বলা যায় দুর্বল সমালোচনা— থাকলেও, দলটি যে বিপুল গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পরপর তিনটি জাতীয় নির্বাচন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে— ভোটসংখ্যার দিক থেকে (প্রাপ্ত আসনসংখ্যা নয়, প্রাপ্ত মোট ভোট) আওয়ামী লীগ ও বিএনপির গ্রহণযোগ্যতা প্রায় সমান সমান। এরকম গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার কারণটি কী? এর পেছনেও আছে ওই একই জিনিস— দলটির দর্শন ও কর্মসূচি। এই দর্শনের সঙ্গে আপনি সহমত পোষণ না-ও করতে পারেন, দেশের অধিকাংশ প্রগতিশীল মানুষ সেটা করেনও না, কিন্তু তাদের যে একটি দর্শন আছে সেটি এড়িয়ে গেলে বা অস্বীকার করা হলে তাদের গ্রহণযোগ্যতার কারণটি ব্যাখ্যা করা যাবে না।

কোন সময়ে এবং কোন প্রেক্ষাপটে দলটির জন্ম হয়েছিল সেটি মনে রাখলে এই দর্শনের স্বরূপ এবং এরকম একটি দর্শনের গ্রহণযোগ্যতার কারণও বোঝা যাবে। শেখ মুজিবের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড, খুনিদের মাস তিনেকের পৈশাচিক উল্লাস ও কর্মকাণ্ড, সেনা অভ্যুত্থান, পাল্টা সেনা অভ্যুত্থান, কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে একটি সফল-সর্বাত্মক সিপাহী বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। কর্নেল তাহেরের পেছনে জাসদের রাজনৈতিক সমর্থন থাকলেও তাঁর বা জাসদ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেতৃত্বের যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা বলতে কিছু ছিলো না, সেটি জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতায় টেনে আনার সিদ্ধান্ত থেকেই বোঝা যায়। কর্নেল তাহের হচ্ছেন বাঙালির ইতিহাসের সেই দুর্লভতম নেতা যিনি— 'দুদিনের মধ্যে বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে পারি'— ঘোষণা দিয়ে সত্যি সত্যিই সেটি ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর এই বিপ্লবী ক্ষমতা সম্বন্ধে আর কারো সম্যক উপলব্ধি ছিলো কি না জানা নেই, কিন্তু জিয়াউর রহমানের যে সেই উপলব্ধি ঘটেছিল সেটি জীবন-রক্ষাকারী বন্ধুকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানোর মধ্যে দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন। নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য জিয়ার সামনে এর বিকল্প কোনো পথই খোলা ছিলো না। একমাত্র কর্নেল তাহেরই পারেন আরেকটি বিপ্লব সংঘটিত করে তাঁকে উৎখাত করতে, একথা জিয়া খুব পরিষ্কারভাবেই বুঝে নিয়েছিলেন। জিয়াউর রহমান ছিলেন কঠোর বাস্তববাদী, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ, অন্যদিকে কর্নেল তাহের ছিলেন আবেগপ্রবণ-রোমান্টিক বিপ্লবী। রোমান্টিসিজম ছাড়া বিপ্লব হয়ও না। সেজন্যই বিপ্লবকে সংহত করার জন্য, তার ফসল ঘরে তুলবার জন্য একটি রাজনৈতিক সংগঠনের দরকার হয়, একা বিপ্লবীর পক্ষে বিপ্ল-ব করে আবার ক্ষমতা সংহত করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে, তাহেরের মতো এমন একজন বিপ্লবী জন্মেছিলেন অথচ তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছিল জাসদের মতো একটি নপুংসক ও হঠকারী রাজনৈতিক দলের ওপর, যার নেতা ছিলেন সিরাজুল আলম খানের মতো একজন আপাদমস্তক বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি। (কর্নেল তাহের যখন বিপ্লবের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে এনেছেন এবং রাজনৈতিক দায়িত্ব নেয়ার জন্য জাসদ-নেতৃত্বের ওপর ভরসা করছেন, তখন জাসদ এই বিপ্লবের জন্য আদৌ প্রস্তুত না থেকেও তাহেরকে কেন বিপ্লবের জন্য গ্রীন সিগন্যাল দিয়েছিল, সেটি এক বিরাট প্রশ্ন। জাসদ কি এটাকে একটা ছেলেখেলা হিসেবে নিয়েছিল? কর্নেল তাহেরের বৈপ্লবিক ক্ষমতা পরীক্ষা করতে চেয়েছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর হয়তো কোনোদিনই পাওয়া যাবে না। কিন্তু ৭ নভেম্বরের বিপ্লবের পর অতিদ্রুত এই বিপ্লব ছিনতাই হয়ে যাওয়ার দায় জাসদেরই। বিপ্লবটি যে জাসদেরই নেতৃত্বে ঘটেছে, সেটি জনগণ জানতেই পারেনি। এমনকি, জেলবন্দী নেতাদের জানানো পর্যন্ত হয়নি যে, এরকম একটি ঘটনা ঘটতে পারে! ফলে বিপ্লবের পর জেলগেট খুলে দিয়ে যখন নেতাদেরকে বেরিয়ে আসার অনুরোধ করা হলো, তারা বেরিয়ে আসতে চাইলেন না!) বস্তুত তাহের হত্যাকাণ্ডের জন্য জিয়াউর রহমানের যতোটুকু দায়, সিরাজুল আলম খানের দায় তার সমান (ইতিহাসের এই অজানা অধ্যায়টি নিয়ে খুব বেশি লেখালেখি হয়নি। ৭ নভেম্বর, ১৯৭৫-এর প্রথম প্রহরে সিপাহি বিদ্রোহের সূচনা করার জন্য যিনি প্রথম 'ফায়ার ওপেন' করেছিলেন, সেই নায়েক সুবেদার মাহবুবুর রহমান সম্প্রতি তাঁর লেখা *সৈনিকের হাতে কলম* বইটিতে এসব অজানা অধ্যায়ের দ্বার উন্মোচন করেছেন। উল্লেখ্য, এই মাহবুবুর রহমানই পরে কর্নেল তাহেরের 'বিচারের' জন্য গঠিত কোর্টমার্শালে রাজসাক্ষী হন সিরাজুল আলম খানের প্ররোচনায়। জনাব খান নাকি তাঁকে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, তিনি রাজসাক্ষী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলে কর্নেল তাহেরকে মুক্ত করা সম্ভব হবে। কিন্তু বিচারের রায়ে কর্নেল তাহেরের ফাঁসির ঘোষণা শুনে তিনি চিৎকার করে এর প্রতিবাদ করেন। পরে তাঁকে জার্মানিতে নির্বাসনে পাঠানো হয়)। যাহোক, জিয়া যখন দল গঠন করলেন তাঁর সামনে আসলে প্রগতিপন্থী কোনো পথ খোলাই ছিলো না। ওই সময় আওয়ামী লীগের মতো একই আদর্শের কোনো দল গঠন করার যে মানেই হয় না, সেটা তো পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায়। আবার কর্নেল তাহেরের হত্যাকাণ্ড জাসদের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী ও সমর্থকদের কাছে জিয়াকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে পরিচিত করে তুলেছিল, ফলে জাসদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তৈরি হওয়ার সুযোগই ছিলো না। তাঁর নিজের কোনো রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ডও ছিলো না, ফলে তাকে একটি ঝুঁকি নিতে হলো এবং প্রগতিবিরোধী সমস্ত শক্তিগুলোকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসার কথা ভাবতে হলো। 'ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি আস্থা, সামাজিক ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' এই চার মূলনীতিকে শুধু দলীয় নয়, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবেই ঘোষণা করলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে অর্জিত রাষ্ট্রীয়-সাংবিধানিক দর্শন 'ধর্মনিরপেক্ষতা' প্রতিস্থাপিত হলো 'ইসলামী মূল্যবোধের ওপর আস্থা' দিয়ে, 'সমাজতন্ত্র' নির্বাসিত হলো তথাকথিত 'সামাজিক ন্যায়বিচারের' কাছে, 'জাতীয়তাবাদ' চেহারা পেলো 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের'। 'গণতন্ত্র' রইলো ঠিকই—ওটা রাখতে হয়, বিশ্বাস না করলেও রাখতে হয়! আর তাছাড়া, সম্ভবত ওই শব্দটির বিকল্প কোনো শব্দ তিনি বা তাঁর পরামর্শকরা খুঁজে পাননি, পেলে সেটিই ব্যবহার করতেন। বোঝাই যাচ্ছে, বিএনপির দলীয় আদর্শগুলো আওয়ামী লীগের মূলনীতির বিপরীত শব্দ দিয়ে সাজানো। যে-কোনো-মূল্যে ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করার মানসিকতা থেকে রচিত এই নীতিগুলো যে একইসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের ফসল আমাদের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি তথা দর্শনের বিরুদ্ধে চলে গেলো, তা হয়তো তারা ভাবলেনই না। প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ এভাবেই রাষ্ট্রের সর্বনাশ করে দেয়! শুধু তা-ই নয়, রাষ্ট্রীয়-সাংবিধানিক মূলনীতিগুলো যে কেবলমাত্র ঘোষণা দিয়ে পরিবর্তন করা যায় না, জনগণের মতামত নিতে হয়—এ কথাটিও তিনি ও তাঁর সহকর্মী-পরামর্শকরা উত্তেজনার বশে ভুলে গেলেন। যখন মনে পড়লো তখন আর ঘোষণাটি ফিরিয়ে নেয়ার মতো বাস্তবতা তাদের ছিলো না, নিলে তাদের অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখে পড়তো। ফলে, পঞ্চম সংশোধনীর সময় যখন এই ঘোষণাকে বৈধতা দেয়ার বিষয়টি সামনে চলে এলো তখন ভুলক্রমে খন্দকার মোশতাক সরকারের এবং বঙ্গবন্ধুর খুনিদের সমস্ত কার্যক্রমকেও তিনি বৈধ করে দিলেন। একটি ভুল অনেকগুলো ভুলের জন্ম দেয়। নইলে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড, কিংবা জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ডের মতো জঘন্য অপরাধের দায় বিএনপি যেচে পড়ে নিজের কাঁধে নিতে যাবে কেন? এসব অপরাধের কোনো দায়দায়িত্ব তো তাদের ছিলো না! জিয়াউর রহমান প্রত্যক্ষভাবে এসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন—তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বঙ্গবন্ধুর হত্যা-পরিকল্পনার বিষয়টি তাঁর গোচরে ছিলো, সেটি তখনকার সমস্ত ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারই গোচরে ছিলো। পরিকল্পনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়টি জানা সত্ত্বেও, ঘটনাটি ঘটার আগেই, তিনি কেন এইসব খুনিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেননি— এই প্রশ্ন করলে, সেই একই দায়ে তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহকেও দায়ী করা যায়। তিনি তো সেনাপ্রধান ছিলেন, এবং বিষয়টি তিনিও জানতেন, তিনি কেন তাঁর অধ্বস্তনদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেননি? তাঁর জন্য তো সেটি অনেক সহজ ছিলো! যাহোক, বিএনপি কেন পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে এর দায়দায়িত্ব নিয়েছে সেটি এক জটিল প্রশ্ন। কোনো উন্মাদের পক্ষেও কোনো হত্যাকাণ্ডের দায়দায়িত্ব যেচে পড়ে নিজের কাঁধে নেয়া সম্ভব নয়। নিয়েছে, তারচেয়ে বলা ভালো, নিতে বাধ্য হয়েছে— কারণ, নতুন ধরনের একটি রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়া, তাকে জনগণের কাছে পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য যে প্রজ্ঞার প্রয়োজন, এই দলের নেতাকর্মীদের তা ছিলো না। ছিলো না বলেই তারা তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। অনেকেই হয়তো বলবেন, সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার খাতিরেই মোশতাক সরকারের কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। ওই যুক্তিতে সেটা করা হলেও, মোশতাক সরকারের সবকিছুকেই বৈধতা দেয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা তো ছিলো না! বঙ্গবন্ধুর খুনিদেরকে রক্ষার জন্য যে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল সেটিকে অবৈধ ঘোষণা করেও তো ওই সরকারকে বৈধতা দেয়া যেত! সেক্ষেত্রে কি সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হতো? হতো না, হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। নিজেদের ভুলত্রুটিগুলোর বৈধতা দিতে গিয়ে অন্যের ভুলত্রুটি-অপরাধ নিজের কাঁধে নেয়ার এমন ঘটনা ইতিহাসে বিরল। যাহোক, আগেই বলা হয়েছে— সমস্ত প্রগতিবিরোধী শক্তিকে নিজের দিকে টানতে গিয়ে বিএনপিকে এমন এক দর্শন গ্রহণ করতে হয়েছিল যা রাষ্ট্রীয় মূলনীতি বিরোধী। এর কারণ জিয়া এবং তাঁর পরামর্শক-সহকর্মীরা ভেবেছিলেন— যেহেতু আওয়ামী লীগ এই রাষ্ট্রীয় দর্শনের ঘোষণা দিয়েছিল, এবং স্বাধীনতার পর যেসব দল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর সুযোগ পেয়েছিল তারাও এই মূলনীতির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেনি, অতএব রাষ্ট্রীয় মূলনীতি এবং এইসব দলের দর্শন একই ব্যাপার। এটি ছিলো একটি বিরাট ভুল। রাষ্ট্রের দর্শন এবং দলের দর্শন যে আলাদা হতে পারে, আলাদা হলেও যে ক্ষমতায় আরোহণ করা যায়, এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড চালানো যায়— এটা তারা ভাবেননি, ভাবার মতো দার্শনিক প্রজ্ঞাও তাদের ছিলো না। আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে তারা তাই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভারতে বা পাকিস্তানে গত ৬০ বছরেও এমনটি ঘটেনি। আগেও বলেছি, ভারতের রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সঙ্গে বিজেপির দলীয় মূলনীতির বড় ধরনের বিরোধ রয়েছে— তারা ক্ষমতায় গিয়ে রাষ্ট্রীয় বা দলীয় মূলনীতির কোনোটিতেই পরিবর্তন না এনেই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে। পাকিস্তানেও এমনটি ঘটেছে। পিপিপি'র দর্শন রাষ্ট্রীয় দর্শনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো না। কিন্তু দুই মেয়াদে ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও তারা রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোতে হাত দেয়নি। বিএনপি যে হাত দিয়েছিল তার কারণ– তারা বুঝতেই পারেনি, রাষ্ট্র কতোকগুলো মৌলিক মূলনীতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, সেগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অক্ষুণ্ন রাখাটা রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক শিষ্টাচারের অন্যতম শর্ত। জিয়াউর রহমান নিজে তাঁর দলের দর্শনের সঙ্গে একমত ছিলেন বলেও মনে হয় না। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কথা বললেও বাঙালী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ তাঁকে নিতে দেখা যায়নি, বরং অনেকক্ষেত্রেই পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ধর্মনিরেপেক্ষতাকে সংবিধান থেকে সরিয়ে দিলেও তিনি নিজে কখনো সাম্প্রদায়িক আচরণ করেননি। বোঝাই যায়, আওয়ামী বিরোধী সেন্টিমেন্টকে পুঁজি করে একটি জনগোষ্ঠীর সমর্থন পেতে চেয়েছিলেন তিনি, এবং সেটি পেয়েছিলেনও। অচিরেই আওয়ামী-বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি এবং চিন্তাশীল অংশটিকে আকর্ষণ করতে সক্ষমও হয়েছিল দলটি। ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী একটি গোষ্ঠী, বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে যারা স্রেফ পাকিস্তানের ভাঙন হিসেবে ভাবতো, মুক্তিযুদ্ধ যাদের কাছে কোনো আলাদা মহিমা নিয়ে হাজির হয়নি কখনো, এমনকি স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী ব্যক্তিবর্গ ও গোষ্ঠীসমূহ জড়ো হলো বিএনপির পতাকাতলে। শুধু তা-ই নয়, বিস্ময়কর হলো বামপন্থীদের একটি বিরাট অংশও এলো তাদের সঙ্গে। বিএনপির দর্শন যে কোনোভাবেই তাদের দর্শনের সঙ্গে যায় না, এটা তাদের বিবেচনাতেই এলো না। তারা বরং আওয়ামী-বিরোধী সেন্টিমেন্ট এবং ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করার জন্যই গেলেন। কিন্তু এই শ্রেণীর ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোন দলে এলো বা কোন দল থেকে বেরিয়ে গেলো তাতে জনগণের কিছু যায় আসে না। নেতার দল ও আদর্শ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমর্থকরাও সেটি পরিত্যাগ করেন, তা-ও বলা যায় না। অতএব, তারা বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠীর সমর্থন সঙ্গে করে বিএনপিতে যোগ দিয়েছিলেন বলে যে ধারণাটি প্রচলিত আছে, সেটি একেবারেই সত্য নয়। তাদের কারণে বিএনপি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে তা-ও সত্য নয়। তাহলে প্রশ্ন তো ওঠেই যে, বিএনপির দর্শন যদি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী হয়ে থাকে তাহলে এত বিপুল জনসমর্থন পেলো কিভাবে? এদেশের ৯৯ ভাগ মানুষই তো মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক, অধিকাংশ লোক সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণও করেছে, তারা কিভাবে বিএনপির সমর্থকে পরিণত হলো? এর কারণ একাধিক। প্রথমত, দর্শন না থাকলে জনগণ একটি দলকে আদৌ গ্রহণ করে না এটি যেমন সত্য, তেমনই সত্য হলো এই যে— একটি দলের দর্শন প্রাথমিক অবস্থায় জনগণের কাছে বিমূর্তরূপে হাজির হয়। এইসব দার্শনিক কথাবার্তা তাদের কাছে কেতাবি কথাবার্তার অধিক মর্যাদা পায় না বা তাদের বোধগম্যতায় প্রবেশ করে না; এর কোনো প্রত্যক্ষ রূপও তারা দেখতে পায় না। দর্শনগুলো জনগণের কাছে বোধগম্য হতে বা পরিস্ফুট হতে অন্তত ২৫/৩০ বছর সময় লাগে। বিএনপির দর্শনগুলো এখন পর্যন্ত জনগণের কাছে ধোঁয়াটে রূপে অবস্থান করছে। 'ইসলামী মূল্যবোধের ওপর আস্থা' না হয় বোঝা যায়, 'গণতন্ত্র' ব্যাপারটা বোঝা না গেলেও এর সঙ্গে নির্বাচন ইত্যাদি জড়িত সেটুকু অনুভব করা যায়, কিন্তু 'সামাজিক ন্যায়বিচার' কী জিনিস? জনগণ মোটাদাগে হলেও সমাজতন্ত্র ব্যাপারটা বোঝে, কিন্তু 'সামাজিক ন্যায়বিচার' বিষয়টি বিএনপির কর্মী-সমর্থক তো দূরের কথা, স্বয়ং নেতারা বোঝেন কি না সন্দেহ আছে। সম্ভবত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিএনপিপন্থী বুদ্ধিজীবীরাও বোঝেন না। এমনকি দলটি গত ৩০ বছরে এর কোনো প্রত্যক্ষ রূপ প্রদর্শন করতেও ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদও বিতর্কের বেড়াজাল কেটে বের হতে পারেনি। জিয়াউর রহমানের লেখালেখি-বক্তৃতা ইত্যাদি থেকে মনে হয়, জাতীয়তাবাদ বলতে তিনি ভৌগলিক পরিচয় অর্থাৎ নাগরিকত্বকে বুঝিয়েছেন। অন্যদিকে এর সমালোচকরা একে পাকিস্তানপন্থী মুসলিম জাতীয়তাবাদের সমার্থক বলে উল্লেখ করে থাকেন। বিষয়টি আসলে কী, সেটা এখন পর্যন্ত জনগণ বুঝেই উঠতে পারেনি। (এমনই আরেকটি না-বোঝা বা ভুল-বোঝা শব্দ 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। ইসলামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা ধর্মনিরপেক্ষতাকে 'ধর্মহীনতা' বলে প্রচার করে মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করেছেন। এই প্রচার যে আদৌ সত্য নয়, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে যে ধর্মহীনতা নয়— সেটি জনগণকে বোঝাতেও নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে এর পক্ষের শক্তি। ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকবে, কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাত দেখাবে না— মোটাদাগে এই হলো ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ, এটুকু বুঝিয়ে বলা গেলেও বিরুদ্ধবাদীরা অপপ্রচারে জয়ী হতে পারতো না।) অতএব একথা বলা যায় যে, প্রাথমিক অবস্থায় বিএনপির দর্শনগুলো সাধারণ মানুষের কাছে দলটির গ্রহণযোগ্যতা তৈরির ব্যাপারে বড় কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। বরং এই গ্রহণযোগ্যতা সীমাবদ্ধ ছিলো আওয়ামী-বিরোধী শিক্ষিত-সচেতন-মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে। তবে মোটাদাগে এই দলটি যে দার্শনিকভাবে আওয়ামী লীগ বিরোধী সেটি বুঝিয়ে দিয়েছিল ওই দর্শনগুলোই। আর তাই, স্বাধীনতার পর ক্ষমতায় আসীন দলটির সীমাহীন ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ জনগণ প্রাথমিকভাবে বিএনপিকে গ্রহণ করেছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতায় না এনে জাসদ যদি নিজেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতো, জনগণ সেটিও একইভাবে গ্রহণ করতো ওই আওয়ামী লীগের প্রতি বিরক্তি এবং ক্ষোভ থেকেই। তবে যে কথাটি না বললেই নয় সেটি হলো, বিএনপির গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার পেছনে মূল চালিকাশক্তি এবং দ্বিতীয় কারণ হিসেবে কাজ করেছে দলটির কর্মসূচি। আগেও বলেছি, শুধু দর্শন দিয়ে জনগণের কাছে পৌঁছানো যায় না, পৌঁছাতে হয় কর্মসূচি দিয়েও। জিয়াউর রহমানের অসংখ্য ত্রুটি যেমন ছিলো, তেমনি দুর্লভ কিছু গুণও ছিলো। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনিই প্রথম রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে নব সব কর্মসূচির উদ্ভাবন করে চমক সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশেষ করে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন-ব্যবস্থাপনা-ব্যবহার ও বাজারজাতকরণে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে জনগণের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের গত ৩৭ বছরের ইতিহাসে আর কোনো রাষ্ট্রনায়ক সশরীরে জনগণের এত কাছাকাছি যেতে সক্ষম হননি। কৃষকের কাঁধে বন্ধুর মতো হাত রেখে বৃক্ষ রোপণ, মৎস্য চাষ, অধিক ফসল উৎপাদনের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করার দুর্লভ দৃশ্য তিনিই এদেশের রাজনীতিতে প্রবর্তন করেছিলেন। অবশ্য এরশাদও জনগণের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁর কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা ছিলো না বলেই এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর চেষ্টাটিকে জনগণ বিবেচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে জিয়ার অনুকরণ হিসেবে, কিন্তু জিয়ার সততা ও আন্তরিকতা নিয়ে মানুষের মনে কোনো প্রশ্ন ছিলো না, এরশাদের ব্যাপারে তা প্রবলভাবেই ছিলো। জিয়ার ব্যক্তিচরিত্রের এই দৃঢ়তা, মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর বীরোচিত ভূমিকা, জনগণের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টির ক্ষমতা এবং তাদেরকে ভবিষ্যতের সুন্দর স্বপ্ন দেখাবার প্রবণতাও বিএনপিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার পেছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। যাহোক, তাঁর শাসনামল দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, ক্ষমতাও তাঁর জন্য স্বস্তিকর হয়নি। শক্তিশালী বিরোধী দল তখন ছিলো না বটে— তাঁকে তাই বিরাট কোনো রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়নি— কিন্তু সামরিক বাহিনীর মধ্যে ঘটে যাওয়া অসংখ্য বিদ্রোহ তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল, এবং এগুলো তাঁকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে দমন করতে হয়েছে। বিদ্রোহ দমনে যে নির্মমতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন সেটি যে-কোনো কল্প-কাহিনীকেও হার মানাবে। একটি সার্বক্ষণিক অস্থিতিশীলতায় তাঁর সরকার টলমল করেছে, যদিও অভ্যন্তরীণ এইসব বিদ্রোহ বাইরে তেমন একটা প্রকাশিত হয়নি। বরং জাতীয় জীবনে একটি আপাত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। তাঁর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড সেটিকে নষ্ট করে দেয়।

জিয়ার জীবদ্দশায় বিএনপি কোনো রাজনৈতিক চরিত্র অর্জন করে উঠতে পারেনি, কোনো শক্তিশালী ভিত এবং সাংগঠনিক কাঠামোও তৈরি করতে পারেনি। ক্ষমতার মধ্যে জন্ম নেয়া কোনো দলের পক্ষে সেটি কঠিনও বটে। ফলে এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর এই দলের ছোটবড় নেতারা ঝাঁকের কৈ-এর মতো নতুন সামরিক শাসকের পদতলে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। বিএনপির দর্শন নয়, ক্ষমতা এবং কেবলমাত্র ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করার জন্যই যে এরা জিয়ার সঙ্গে ভিড়েছিলেন— এই ঘটনাই তার প্রমাণ দেয়। আর ওই সময়টিই ছিলো বিএনপির জন্য এক অগ্নিপরীক্ষার কাল। দলটির বৃহত্তম অংশ এরশাদের সঙ্গে যোগ দেয়ার পরও বিএনপি আদৌ টিকে থাকবে কি না তা নিয়ে সংশয়ের যথেষ্ঠ কারণ ছিলো। দলে রয়ে যাওয়া ক্ষুদ্র অংশটি তাই গৃহবধু খালেদা জিয়াকে রাজনীতিতে নিয়ে আসে। খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বা দূরদর্শিতা ছিলো এমন কোনো প্রমাণ তিনি দেখাতে না পারলেও ব্যক্তিগত আবেগে তাড়িত হয়েই হয়তো তিনি এরশাদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। এর দুটো কারণ ছিলো। প্রথমটি, এরশাদই বিএনপিকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন; দ্বিতীয়টি, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জিয়া হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এরশাদের সংশ্লিষ্টতা ছিলো। এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে প্রকাশ্য জনসভায় তিনি এরশাদকে জিয়া হত্যার জন্য অভিযুক্তও করেছিলেন। এরশাদ প্রশ্নে তাঁর এই আপোসহীন অবস্থানটি ব্যক্তিগত আবেগ থেকে উদ্ভূত হলেও জনগণের কাছে সেটি পরিষ্কার না হওয়ায় তিনি পরিণত হন এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনের আস্থা ও আপোসহীনতার প্রতীকে, আর বিএনপি পায় আপোসহীন দলের ইমেজ। এবং এই আন্দোলনের ভিতর দিয়েই বিএনপি রাজনৈতিক চরিত্র অর্জন করে এবং রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। বলা প্রয়োজন, সামরিক স্বৈরশাসন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরোধী ওই আন্দোলনটির সঙ্গে জনগণের, বিশেষ করে শহুরে মধ্যবিত্ত জনগণের সম্পর্কটি ছিলো আবেগতাড়িত; আর এ কথা তো সবাই জানেন ও মানেন যে, এ দেশের সমস্ত আন্দোলন-সংগ্রামের প্রাণকেন্দ্রে সবসময়ই অবস্থান করেছে মধ্যবিত্তরা। বিএনপি সেই আবেগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হয়েছিল। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে দলটির শীর্ষ নেত্রীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের নানা পর্যায়ে এরশাদ সরকারের সঙ্গে আঁতাত ও আপোসের অভিযোগ ওঠে এবং দলটি এই অভিযোগের সন্তোষজনক জবাব দিতে ব্যর্থ হয়। বরং '৮৬-এর নির্বাচনে অংশগ্রহণ এই অভিযোগের তীব্রতাকে বাড়িয়ে দেয়। এমন একটি আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত দলটি কেন নিয়েছিল সেটি এখন পর্যন্ত পরিষ্কার নয়। শুধু তাই নয়, এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর শেখ হাসিনার আগ বাড়িয়ে— 'আমি অখুশি নই' জাতীয় মন্তব্যও জনগণ ভালোভাবে নেয়নি। এরশাদের সঙ্গে লং ড্রাইভে গিয়ে আন্দোলনকে ছুরিকাঘাত করার অভিযোগও তাঁর ও দলের জন্য বিব্রতকর অবস্থার তৈরি করে (অভিযোগটি আবার তুলেছিলেন এরশাদ সরকারের উপরাষ্ট্রপতি ডিগবাজি-বিশারদ মওদুদ আহমদ!)। এসবের প্রতিফলন দেখা যায় '৯১-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। ওই নির্বাচনে বিএনপি জয়ী হয়ে সরকার গঠন করবে— এ কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। কারণ তিনশ' আসনে প্রার্থী দেয়ার মতো যোগ্য লোকও তাদের ছিলো না। সাংগঠনিক অবস্থাও ছিলো করুণ। গ্রাম পর্যায়ে তো দূরের কথা, থানা পর্যায়ে— এমনকি কোনো-কোনো জেলায়ও তাদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড ছিলো না। অন্যদিকে নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ এমন আচরণ শুরু করে যেন তারা ক্ষমতায় এসেই পড়েছে! 'বিএনপি ১০টির বেশি আসন পাবে না'— আওয়ামী-নেত্রীর এই জাতীয় মন্তব্য, নির্বাচনের দু-তিনদিন আগে জাতির উদ্দেশ্যে বেতার-টেলিভিশন ভাষণে জিয়া ও এরশাদকে এক কাতারে ফেলে তীব্র সমালোচনা করার মধ্যে দিয়ে সেইসব আচরণ প্রকাশিত হয়েছিল। সাংগঠনিক দিক দিয়েও আওয়ামী লীগ ছিলো শত মাইল এগিয়ে। যোগ্য-অভিজ্ঞ প্রার্থীর অভাবও তাদের হয়নি— তবু নির্বাচনে জয়লাভ করলো বিএনপি। এটি ছিলো স্বৈরশাসন-বিরোধী আন্দোলনে বিএনপির ভূমিকার প্রতি জনগণের আস্থার প্রতিফলন এবং আওয়ামী লীগের প্রতি অনাস্থার জবাব। এ ঘটনা থেকেও বোঝা যায়, জনগণের মন-মতো কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে গেলে জনগণ তার পুরস্কার দেয়। '৬০ দশকে আওয়ামী লীগ যেমন বাঙালি জনগোষ্ঠীর প্রতিটি আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বুকে ধারণ করে, বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় জনগণকে জাগ্রত করে আন্দোলনকে একটি গণঅভ্যুত্থানের দিকে নিয়ে গিয়েছিল এবং এর পুরস্কার পেয়েছিল '৭০-এর নির্বাচনে, ঠিক ওই মাত্রার না হলেও '৮০-এর দশকে বিএনপির আপোসহীন ইমেজ ও কর্মকাণ্ড দলটিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় ফিরিয়ে এনেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতক্ষণ ধরে যা যা বলা হলো তাতে মনে হতে পারে রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি বলতে শুধুমাত্র আন্দোলন-সংগ্রামকেই বোঝায়, এবং এই ধরনের কর্মসূচি দিলেই জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়! বিষয়টি আদৌ সেরকম নয়। মূল বিষয় হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই হোক, বা ক্ষমতার বাইরে থেকে আন্দোলন-সংগ্রাম-দাবিদাওয়া আদায়ের ব্যাপারেই হোক, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন-প্রত্যাশা ইত্যাদি উপলব্ধি করে কর্মসূচি নির্ধারণ করলেই কেবল গ্রহণযোগ্যতা মেলে। আবার আন্দোলনের বেলায়, আন্দোলনটি কার বিরুদ্ধে করা হচ্ছে, কেন করা হচ্ছে, এর ফলাফল কী, আন্দোলনরত দলটি ক্ষমতায় গেলে জনগণের কল্যাণে কী কী কর্মসূচি গ্রহণ করবে— সেই বিষয়গুলো জনগণ অবশ্যই বিবেচনায় রাখে। আওয়ামী লীগের জন্মের পর থেকে অন্তত এক যুগের মধ্যে দলটির তেমন কোনো প্রভাব জাতীয় রাজনীতিতে ছিলো না। '৬০-এর দশকে সেটি তারা অর্জন করে নেয় মূলত ছয় দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং '৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব জয়লাভের মূলভিত্তিও ছিলো ওই ছয় দফা কর্মসূচি। সবাই জানেন যে, এই ছয় দফায় ছিলো পূর্ণমাত্রার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি বা প্রস্তাব। কেতাবি ভাষায় এই দাবিগুলো লিখিত হলেও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সহজ ভাষায় জনগণকে একথা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ছয় দফা বাস্তবায়িত হলে পশ্চিম পাকিস্তানিদের রাজনৈতিক নিপীড়ন থেকে যেমন মুক্তি মিলবে, তেমনি নিজেদের সম্পদ নিজ দেশে রেখে তার সর্বোত্তম ব্যবহার করে উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা করা সম্ভব হবে, যার ফলে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জিত হবে। জনগণ চায়ও ওই দুটো জিনিসই—আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা, এবং জীবনযাপনে অবাধ স্বাধীনতা। '৭০-এর নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করতে সক্ষম হলে, এই কর্মসূচি আদৌ বাস্তবায়ন করতে পারতো কি না, সেটি নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। অর্থাৎ পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আদৌ তা বাস্তবায়ন করতে দিতো কি না সেটা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা চলে। কিন্তু যেহেতু তারা ক্ষমতায় যেতে পারেনি, তাদের বিরুদ্ধে তাই ব্যর্থতার অভিযোগ বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ তোলাও অবান্তর বলে মনে হয়েছে জনগণের কাছে। আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের সমর্থন ও আস্থা তাই অব্যাহতই ছিলো। ফলে, যুদ্ধ শুরু হলে দল-মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব মেনে নিতে আপত্তি করেনি, যদিও তখন আরো অনেকগুলো দল সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল, বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মওলানা ভাসানীর মতো অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতাও উপস্থিত ছিলেন। এমনকি যুদ্ধের পর সদ্য-স্বাধীন দেশে এককভাবে আওয়ামী লীগের সরকার গঠনের অধিকার আছে কি না, তা নিয়েও কেউ প্রশ্ন তোলেনি। দেশ স্বাধীন হবার পরে পাকিস্তান আমলের নির্বাচনী ফলাফল তো বাতিলই হয়ে যাবার কথা, সেক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও নির্বাচনে বিশ্বাসী আওয়ামী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীগ তো নিজেদেরকে নির্বাচিত সরকার দাবি করতে পারে না! আওয়ামী লীগের সরকার '৭৩-এর জাতীয় নির্বাচনের আগ পর্যন্ত তা ছিলোও না, ছিলো বিপ্লবী সরকার। কিন্তু বিপ্লবী সরকারই বা কেন একদলীয় হবে— যুদ্ধ তো তারা একা করেনি, এই প্রশ্নও কেউ উত্থাপন করেনি। এসবই ঘটেছে বঙ্গবন্ধুর আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা এবং আওয়ামী লীগের প্রশ্নাতীত গ্রহণযোগ্যতার জন্য। ক্ষমতায় গিয়ে আওয়ামী লীগ জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং জনগণ তাদের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। যদিও বঙ্গবন্ধুর কোনো বিকল্প ছিলো না, কিন্তু দল হিসেবে আওয়ামী লীগ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জনগণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বেদনায়, স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় কাতরাতে থাকে। অন্যদিকে বিএনপির জন্মই ক্ষমতা-কাঠামোর ভিতর থেকে; ফলে ক্ষমতায় যাওয়ার আগে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়নি তাদের, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রশ্নও ওঠেনি তাই। তাছাড়া বিএনপির সরকার তুলনামূলকভাবে আওয়ামী লীগের চেয়ে সফল সরকার বলেই বিবেচিত হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ অল্পতেই খুশি হয় বলে এই সফলতাকেই বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করেছিল। যাহোক— কর্মসূচি যেমনই হোক না কেন, জনগণ সেগুলোর মধ্যে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখতে চায়, তাদের সংকট-সমস্যার সমাধান দেখতে চায়। সেটা পেলে সেই কর্মসূচিকে তারা সমর্থন করে, নিজেরা তাতে অংশগ্রহণও করে। আর জনকল্যাণমুখী কর্মসূচির গুরুত্বই এখানে।

৫

দুটো বিষয়ের কথা আমরা এই লেখায় বারবার উল্লেখ করেছি—দর্শন ও কর্মসূচি। এ দুটো বিষয়ের সমন্বয়ই একটি দলকে জনগণের কাছে নিয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে বামপন্থী দলগুলোর তেমন কোনো গ্রহণযোগ্যতা বাংলাদেশে তৈরি হলো না কেন? এই দলগুলো আর কিছু না হোক, দর্শনের চর্চা খুব কঠোরভাবেই করে থাকে। এমন কোনো বামপন্থী দল নেই যাদের দর্শন ও কর্মসূচি বিষয়ক দলিল নেই। এত নিষ্ঠার সঙ্গে এ দুটোর আনুষ্ঠানিক চর্চা তারা করে থাকে যে, গন্তব্যের কথা ভুলেই যায়; আদৌ তাদের কোনো গন্তব্য আছে কি না তা-ও বোঝা যায় না। তবু কেন বাংলাদেশে তাদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হলো না? এ দেশে বিপ্লবের সমস্ত কারণ-উপাদান-লক্ষণ-সম্ভাবনা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, এবং এসব দলের নেতাকর্মীদের প্রশ্নহীন আন্তরিকতা থাকলেও কেন বিপ্লবী কোনো পরিস্থিতি তৈরি করা সম্ভব হলো না? এই ব্যর্থতা প্রধানত তাদের কর্মসূচির ব্যর্থতা। বাংলাদেশের মানুষ গত ৬০ বছরেও বুঝে উঠতে পারেনি— এই দলগুলো আসলে কী চায়! এমনকি সহজ ভাষায় নিজেদের নীতি-আদর্শ-দর্শন বা কর্মসূচি জনগণকে বুঝিয়ে বলতেও এঁরা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এঁরা কতোকগুলো মুখস্থ শব্দে বক্তৃতা দেন— বুর্জোয়া, সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক চক্রান্ত, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদের থাবা— ইত্যাদি তাদের খুবই প্রিয় শব্দ। নেতারা তো বটেই, এইসব দলের নিচুস্তরের কর্মীরাও এইসব শব্দ অহরহ ব্যবহার করে থাকেন। একটু কান পাতলেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব ভারী ভারী শব্দের অত্যাচারে কান পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। যাদের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলো বলা হয়, সেই কৃষক-শ্রমিক-খেটে খাওয়া মানুষ এসব শব্দের মানেই বুঝতে পারে না— সাড়া দেবে কীভাবে? বাংলাদেশের বাম দলগুলো ক্ষমতায় গেলে কীভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে সে-সম্বন্ধে কিছু বলা তো দূরের কথা, আজ পর্যন্ত ক্ষমতায় যাওয়ার ডাক-ই দেয়নি। এঁরা নানারকম কর্মসূচি দিয়ে থাকে, সেগুলো অবশ্যই জনগণের পক্ষে। যেমন, গত কয়েকবছরে তেল-গ্যাস-কয়লা-বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষার জন্য যেসব আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে তার সবগুলোই সংগঠিত হয়েছে বাম দলগুলোর নেতৃত্বে। বড় দলগুলো যখন এই সমস্তকিছু বিদেশীদের হাতে তুলে দেওয়াটাকে নিজেদের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করছিলো, তখন বামদলগুলোই কেবল দেশ ও জাতির সম্পদ রক্ষার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। জনগণ এসব আন্দোলনে বিপুলভাবে সাড়াও দিয়েছে। কিন্তু এ-ও সত্য— জনগণ ভাবে, এই দলগুলো বোধহয় তাদের কর্মকাণ্ড এই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখবে, ক্ষমতায় তারা যেতেই চায় না। অন্যদিকে ছোটখাটো কারণে দল ভেঙে যাওয়া প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এসব ভাঙনের পেছনে নাকি আদর্শিক কারণ থাকে, কিন্তু কী কারণে দলটি ভাঙলো সে-সম্বন্ধে কোনো ব্যাখ্যা জনগণের কাছে দেবার প্রয়োজনও তারা অনুভব করে না। খুঁজলে হয়তো দেখা যাবে– অতি তুচ্ছ কারণে দলের ভাঙন ঘটেছে। বড় কোনো লক্ষ্য থাকলে, বিপ্লব সংঘটিত করার আকাঙ্ক্ষা থাকলে, রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন থাকলে, সর্বোপরি দেশে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের প্রতিজ্ঞা থাকলে এসব তুচ্ছ কারণ এড়িয়ে যাওয়া যেত! আবার একমাত্র নিজেদেরকে বামপন্থী দল হিসেবে দাবি করে অন্যান্য বামপন্থী-দাবিদার দলগুলোর বিরুদ্ধে বিষোদগারও তাদের এক প্রিয় অভ্যাস। ধারণা করি— বাম দলগুলো যেন জেনে ফেলেছে যে, তাদের পক্ষে কোনোদিনই বিপ্লব সংগঠিত করা সম্ভব নয়, এমনকি সম্ভব নয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়াও; আর তাই তারা এসব ছোটখাটো কারণ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। আমার ধারণা, সব বামদল মিলে একটি দলে পরিণত হওয়া অসম্ভব হলেও, নূন্যতম কর্মসূচির ভিত্তিতে একত্রিত হয়ে একটি মোর্চা গঠন করে তারা যদি তাদের কর্মসূচিগুলো জনগণের সামনে হাজির করে, কিংবা ক্ষমতায় যাওয়ার ডাক দেয়, তাহলে বিরাট একটি সাড়া পাওয়া তাদের জন্য অসম্ভব নয়। তাদের সততা, ত্যাগ, প্রতিজ্ঞা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, নীতি, আদর্শ ইত্যাদি নিয়ে জনগণের মনে কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু এই কাজটি করাই তো তাদের জন্য এক অসম্ভব ব্যাপার!

৬

এ প্রসঙ্গে জামায়াত ও অন্যান্য ইসলামিক দলগুলোর কথাও বলা যেতে পারে। এদেশের সুবিধাবাদী মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো তো বটেই এমনকি শিক্ষিত-প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত বলে থাকেন যে, আমাদের জনগণ 'ধর্মপ্রাণ' কিংবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ধর্মভীরু' কিন্তু 'ধর্মান্ধ' নয়। আবার ইসলামী দলগুলোর দর্শন ও কর্মসূচি দুটোই ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। তারা ক্ষমতায় যাওয়ার কথা বলে, ক্ষমতায় গেলে ইসলামী শরিয়া অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করার কথাও পরিষ্কারভাবেই বলে। তাহলে ধর্মের ধ্বজাধারী এই দলগুলোর কোনো জনভিত্তি নেই কেন? 'ধর্মভীরু'-'ধর্মপ্রাণ' জনগণ তাদের গ্রহণ করে না কেন? কোনো দলের কাঁধে সওয়ার না হয়ে এককভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে জামায়াতের মতো সুসংগঠিত দলও কেন চরমভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়? কারণটিকে জটিল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখলে এর একটি সহজ উত্তরও মেলে। আমাদের জনগণ সম্বন্ধে যা বলা হয় প্রকৃতপক্ষে তার কোনোটিরই বাস্তব ভিত্তি নেই। ধর্মান্ধ তো নয়ই, এমনকি তারা ধর্মপ্রাণ বা ধর্মভীরুও নয়। এদেশের মানুষ বড়জোর বিশ্বাস করে যে, একজন আল্লাহ/ঈশ্বর আছেন, বিপদে পড়লে তাকে ডাকাডাকিও করে, কিংবা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে— যেমন জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে ইত্যাদি— ধর্মীয় রীতি মেনে চলে, অথবা ঈদ-শবেবরাত-পূজা ইত্যাদি পালন করে কিন্তু তাদের দৈনন্দিন জীবনাচরণে ধর্মের স্থান সামান্যই। এদেশের প্রায় ৮০ ভাগ শ্রমজীবী মানুষ ধর্মকর্মের ধারে-কাছেও যায় না, এ নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথাও আছে বলে মনে হয় না (ধর্মকে ভয় পেলে বা ধর্ম-অন্ত-প্রাণ হলে তো এমনটি হবার কথা নয়!)। আর তাই ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি এদেশের মানুষ একেবারেই পছন্দ করে না। মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাই এদেশে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর গ্রহণযোগ্যতা প্রায় শূন্যের কোঠায়। তাছাড়া, মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতের ন্যাক্কারজনক ভূমিকা এই দলটির গ্রহণযোগ্য হবার ব্যাপারে একটা হিমালয়সম বাধা হিসেবে কাজ করে। এখানটায় এসে বিএনপির গ্রহণযোগ্যতার প্রসঙ্গ আবার আলোচনায় আসতে পারে। বাংলাদেশের প্রায় পঁচাত্তর ভাগ মানুষ মোটাদাগে আওয়ামী-বিএনপি ভাগে বিভক্ত বলে প্রগতিশীল রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও বুদ্ধিজীবীরা বিশ্বাস করেন এবং বলে থাকেন যে, আওয়ামী লীগ হলো অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি আর বিএনপি এর উল্টোটা। সেক্ষেত্রে বিএনপির নেতাকর্মী-সমর্থক সবাই মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি! এই কথা বলার মাধ্যমে-যে দেশের অন্তত অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে— এই অতি উৎসাহী বুদ্ধিজীবীরা সেটা ভুলে যান। বস্তুতপক্ষে বিএনপির আদর্শ ও কর্মসূচিকে যারা সমর্থন করেন, তাদের সবাই মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল নন। বিএনপির 'ইসলামী মূল্যবোধে আস্থা' আর জামায়াত বা এই ধরনের দলগুলোর ধর্ম-রাজনীতি এক জিনিস নয়। 'ধর্মনিরপেক্ষতার' বিপরীতে বিএনপি এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছে বটে কিন্তু এর প্রতিষ্ঠাতা বা অধিকাংশ নেতাকর্মী সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেননি। তাছাড়া এই দলের নেতাকর্মীদের এক বিরাট অংশ সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। অতএব ঢালাওভাবে তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের-বিপক্ষ শক্তি বলাটা সমীচীন হবে না। 'ইসলামী মূল্যবোধের' কথা বললেও এবং মাঝে মাঝে— 'আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদেশের মসজিদে আজানের বদলে উলুধ্বনি শোনা যাবে'— এই ধরনের ন্যাক্কারজনক সাম্প্রদায়িক বক্তব্য বিএনপি-নেত্রীর কণ্ঠে শোনা গেলেও জনগণের কাছে তারা নিজেদেরকে খানিকটা মধ্যপন্থী দল হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। সেজন্যই তাদের গ্রহণযোগ্যতা আছে, ইসলামী দলগুলোর নেই।

৭

বিএনপির মতো জাতীয় পার্টির জন্মও হয়েছিল সামরিক শাসকের পকেট থেকে। কিন্তু এ দুটো দলের মধ্যে পার্থক্য হলো— শুরু থেকেই বিএনপির একটি নতুন ধরনের দর্শন ও কর্মসূচি ছিলো, জাতীয় পার্টির তা ছিলো না। তাদের দর্শন মূলত বিএনপির দর্শনেরই হুবহু নকল (যাকে বলে 'ট্রু কপি')। জিয়ার ১৯ দফা কর্মসূচির আদলে এরশাদও ১৮ দফা কর্মসূচি দিয়েছিলেন, সেটাও ওই ১৯ দফার প্রায় নকল। জনগণ এই দর্শন-কর্মসূচির মধ্যে নতুন কিছু খুঁজে পায়নি। এরশাদ তাঁর পুরোটা শাসনকাল জুড়েই জিয়াকে অনুকরণ করে গেছেন, কিন্তু জনগণের কাছে জিয়ার মতো গ্রহণযোগ্যতা পাননি। এর কারণ বহুবিধ। জিয়ার ব্যক্তিগত সততা ছিলো প্রশ্নাতীত এবং প্রবাদতুল্য, আর এরশাদের সততা নিয়ে সবসময়ই প্রশ্ন ছিলো। নারীঘটিত কেলেংকারির সঙ্গে জিয়ার নাম উচ্চারিত হয়নি একবারও, আর এরশাদের নারী-কেলেংকারি নিয়ে শত শত পর্ণো-উপন্যাস লেখা যায়! জিয়ার নামের সঙ্গে দুর্নীতি শব্দটি যুক্ত হয়নি কখনো, আর এরশাদ হয়ে উঠেছিলেন দুর্নীতির সমার্থক শব্দ। তাছাড়া এরশাদই এদেশে দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন, জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, প্রজাতন্ত্রের সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মচারী-কর্মকর্তাদের জন্য নানারকম বিপত্তি সৃষ্টি করেন, এবং এমন একটি ধারণার জন্ম দেন যে, দুর্নীতি করা তেমন খারাপ ব্যাপার নয়, টিকে থাকতে হলে 'এসব' করতে হয়! সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্নীতির যে মহোৎসবের খবর পত্রিকার পাতায় পাতায় শোভা পাচ্ছে তার শুরুটা হয়েছিল এরশাদের হাত ধরেই। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে দুর্নীতিকে উৎসাহিত করার এমন ঘটনা এরশাদের আগে আর কেউ ঘটাননি। দরিদ্র দেশগুলোতে দুর্নীতি হয়তো থাকে, বাংলাদেশেও এরশাদের আগে থেকেই তা ছিলো, কিন্তু সেগুলো হতো স্বল্পমাত্রায়, আড়ালে-আবডালে। দুর্নীতিবাজরা নিজেদেরকে অপরাধী মনে করতো, অন্তত এতটুকু মূল্যবোধ সমাজে ছিলো। এরশাদ অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে সেই মূল্যবোধ ও নৈতিকতাবোধের গোড়া কেটে দিতে সক্ষম হন। বাংলাদেশ যেহেতু নেতাকেন্দ্রিক দেশ, নেতাকে ঘিরেই আবর্তিত হয় দলীয় ও জাতীয় রাজনীতি, জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতার এই দুর্নীতি, নারী কেলেংকারী, শঠতা ইত্যাদি দলটিকে কখনো জনগণের কাছে পৌঁছতে দেয়নি। তাছাড়া তাদের দর্শন ও কর্মসূচির মধ্যে এমন কোনো নতুন বিষয় ছিলো না যে, জনগণ বিএনপির বিকল্প হিসেবে তাদেরকে গ্রহণ করবে। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দলটির তাই বিপর্যয় নেমে আসে। 'গণশত্রু' আখ্যা পাওয়া এই দলের নেতাদের অন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো দলে স্থান দেয়া যাবে না— ছাত্রদের এই দাবির মুখে তিন জোটভুক্ত দলগুলোতে পতিত নেতারা স্থান পাননি বলে তাৎক্ষণিকভাবে জাতীয় পার্টির ভিতরকার অবস্থা বোঝা যায়নি। কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই দলটি বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এর নেতারা— যারা একসময় এরশাদের পদতলে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়ে সুখী হতেন— অন্যান্য দলে যোগ দেন। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির ইতিহাসেও বিপর্যয় নেমে এসেছিল এবং দুই ক্ষেত্রেই এর শীর্ষনেতারা নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু জাতীয় পার্টির শীর্ষনেতা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তার দলে যে বিপর্যয় নেমে এসেছে তাতে করেই এই দলের দার্শনিক ও কর্মসূচির সীমাদ্ধতা প্রমাণিত হয়। দলটি অবশেষে তাদের দর্শন ও কর্মসূচির অভাবে একটি আঞ্চলিক দলে পরিণত হয়েছে।

৮

যে প্রসঙ্গ দিয়ে এই লেখা শুরু করেছিলাম, এখানটায় এসে তার পুনরুল্লেখ করা দরকার। বাংলাদেশে দল ভাঙার সংস্কৃতি নতুন নয়। কিন্তু কেন যে ভাঙে, দলত্যাগী নেতারা যে নতুন দলের জন্ম দেন তার আদর্শ ও কর্মসূচি যে কী, তা কখনোই পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। ফলে, মনে হয়– এই ভাঙনের পেছনে কোনো আদর্শিক কারণ কাজ করেনি, করেছে নেতৃত্বের সংঘাত ও ক্ষমতার লোভ। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যায় :

স্বাধীনতার আগেই আওয়ামী লীগ ভেঙে গিয়েছিল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা নেয়ার প্রশ্নে দলীয় অবস্থান বা কর্মসূচি কী হবে— মূলত এরকম একটি আদর্শিক বির্তক থেকেই এই ভাঙনের উৎপত্তি। মাওলানা ভাসানী ছিলেন আপাদমস্তক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নেতা, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাঁর এই অবস্থান থেকে বিচ্যুত হননি। অন্যদিকে সোহরোয়ার্দি ছিলেন মার্কিনীদের কাছে আত্মা ও মস্তিষ্ক বিকিয়ে দেয়া ক্ষমতালোভী নেতা (প্রিয় পাঠক, মনে করে দেখুন— অল্প সময়ের জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েই তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন : পূর্ব পাকিস্তানকে ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে!), ফলে ওই প্রশ্নে তাদের একমত হওয়া সম্ভব ছিলো না। মাওলানা ভাসানী তাই আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে গিয়ে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' নামে বামঘেঁষা নতুন দল গঠন করেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর এই আওয়ামী লীগই বহুবার ভেঙেছে এবং কোনোবারই এর কারণ বোঝা যায়নি। বঙ্গবন্ধু নিহত হবার পর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত মিজানুর রহমান চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, কামাল হোসেন, কাদের সিদ্দিকী প্রমুখ নেতা আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে গিয়ে নতুন দল গড়েছেন। কিন্তু তাদের নতুন কোনো আদর্শ বা কর্মসূচি আছে কি না তা বোঝা যায়নি। মিজানুর রহমান চৌধুরী বা আবদুর রাজ্জাক কেন দল ভেঙেছিলেন সেটা বোঝা কঠিন, অনেকে এর পেছনে সামরিক সরকারের ইন্ধন ছিলো বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু কামাল হোসেন এবং কাদের সিদ্দিকী যে স্রেফ শেখ হাসিনার সঙ্গে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব থেকেই আওয়ামী লীগ থেকে সরে এসেছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মিজান চৌধুরীর আওয়ামী লীগ বা আবদুর রাজ্জাকের বাকশাল বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু কামাল হোসেনের 'গণফোরাম' বা কাদের সিদ্দিকীর 'কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ' দলদুটোর অস্তিত্ব যেহেতু এখনো আছে— কৌতূহলী পাঠকরা ইচ্ছে করলে এদের গঠনতন্ত্র-ঘোষণাপত্র ইত্যাদি পড়ে দেখতে পারেন এবং খুঁজে দেখতে পারেন যে, তাদের এই দল গঠনের পেছনে এমন কোনো দার্শনিক-আদর্শিক কারণ কাজ করেছে কি না! একই ব্যাপার ঘটেছে বিএনপির বেলায়ও। দলটি যে কতোবার ভেঙেছে তার হিসেব আমার জানা নেই। এরশাদ ক্ষমতায় আসার পরপরই শাসুল হুদা চৌধুরী, ডা. আবদুল মতিন প্রমুখের নেতৃত্বে দল ভেঙে যায়। এই অংশটির পুরোটাই পরে জাতীয় পার্টিতে যোগ দেয়। শওকত হোসেন নীলুর নেতৃত্বে একবার, ওবায়দুর রহমানের নেতৃত্বে আরেকবার বিএনপি ভেঙেছিল। সাম্প্রতিককালে বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নেতৃত্বে একবার, অলি আহমদের নেতৃত্বে আরেকবার বিএনপিতে ভাঙন ঘটেছে। কিন্তু এই নতুন দলগুলোও কোনো নতুন নীতি-আদর্শ-কর্মসূচির কথা জনগণকে জানাতে পারেনি। জাসদও বহুবার ভেঙেছে। জাসদ (রব), জাসদ (ইনু), বাসদ ইত্যাদি সবই মূল জাসদের অংশ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভেঙেছে বামপন্থী দলগুলো, কিন্তু কী কারণে যে এই দলগুলো ভেঙেছে, কিংবা ভাঙার ফলে কোন লক্ষ্যটা অর্জিত হয়েছে, সেসব সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেনি মানুষ।

৯

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই রাজনৈতিক দলগুলোর আদর্শ ও কর্মসূচিতে ভিন্নতা ছিলো, আছে এবং থাকবে। না থাকলে তো আর অনেকগুলো দলের জন্মই হতো না, একটি দলই রাষ্ট্র পরিচালনার একচ্ছত্র অধিকার পেতো! কিন্তু এই মতভিন্নতা, মতবিরোধ ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ দেশেই রাষ্ট্রের দর্শন-আদর্শ-মূলনীতি সম্বন্ধে এক ধরনের জাতীয় ঐকমত্য আছে এবং রাজনৈতিক দলগুলো এইসব আদর্শ নিয়ে অহেতুক বিতর্ক তৈরি করে না। বাংলাদেশে সেই ধরনের কোনো জাতীয় ঐকমত্য তৈরি হয়নি, এবং না হওয়ার জন্য দলগুলোর দায়দায়িত্বই সবচেয়ে বেশি। তারা নিজেদের দলের আদর্শ রাষ্ট্রের কাঁধে চাপিয়ে দিতে চেয়েছে, কিন্তু একবারও জানার চেষ্টা করেনি যে, এই রাষ্ট্রের বাসিন্দারা এই আদর্শ আদৌ মান্য করবে কি না! স্বাধীনতার পর যেসব আদর্শকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল সেগুলো কোনো বিশেষ দলের আদর্শ ছিলো না, বরং মুক্তিযুদ্ধের ভিতর দিয়ে উঠে আসা ওই আদর্শে ছিলো জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন-প্রত্যাশার প্রতিফলন, যে জাতি এক বিপুল ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে, রক্তপাত ও জীবনদানের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা অর্জন করে নিয়েছিল। যেহেতু মুক্তিযুদ্ধ বিষয়টিই ঘটেছিল একটি জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং সেটিতে কতিপয় জাতিদ্রোহী গোলাম-নিজামী ছাড়া সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিল, তাই ওই আদর্শগুলো নিয়ে কারো কোনো দ্বিমত ছিলো না। কিন্তু পরবর্তীকালে এগুলোকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই বিতর্কিত করে তোলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে। ফলে এখন এক দল বাংলাদেশী তো আরেক দল বাঙালি, একদল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ইসলাম ধর্মের একাধিপত্যে বিশ্বাসী তো আরেকদল ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। এই ধরনের জটিলতা আর কোনো দেশে আছে কি না সন্দেহ। স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরও এসব নিয়ে আমাদেরকে কথা বলতে হচ্ছে, যদিও অনেক আগেই এগুলোর মীমাংসা হয়ে যাওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু হয়নি বলে যে কোনোদিন হবে না তা তো আর নয়, আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে এই দাবি জানাতে পারি— তাদের দলীয় আদর্শ যা-ই হোক না কেন, রাষ্ট্রীয় আদর্শগুলোর বিষয়ে সব দল একমত হয়েই একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং সংসদে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এর প্রতিফলন ঘটাবেন। তবে একটি কথা না বললেই নয়— এই আদর্শগুলো অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে সামনে রেখে নির্ধারণ করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধই আমাদের বাতিঘর, একমাত্র এই একটি বিষয়ই জাতিকে যে-কোনো সময় যে-কোনো পরিস্থিতিতে এক সুতোয় গেঁথে দিতে পারে।

এ তো গেলো রাষ্ট্রীয় আদর্শের বিষয়, দলীয় আদর্শ? সেটিও যে যার মতো করে ঠিক করে নেবে। গণতান্ত্রিক সমাজে এ বিষয়ে কারো কিছু বলার নেই। কারণ এসব দলীয় আদর্শ গ্রহণ করবার বাধ্যবাধকতা যেমন জনগণের নেই, তেমনই প্রত্যাখ্যান করার অধিকারও সবার আছে। পছন্দ না হলে প্রত্যাখান করলেই চলবে। কিন্তু কর্মসূচিগুলো কীভাবে নির্ধারিত হবে? গত কয়েক বছরে দলগুলোর মধ্যে যে কর্মসূচি বিষয়ক অনীহা দেখা গেছে, তাতে মনে হচ্ছে— সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোরও যে আদর্শ ও কর্মসূচির পরিবর্তন-পরিমার্জন করে নিতে হয় এ কথা যেন তারা ভুলেই গেছে। আর এই কর্মসূচির মূলে আছে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আমাদের দেশের জন্য যে কল্যাণকর হয়নি একথা এখন সবাই স্বীকার করেন। যে দেশের ৭০ ভাগ মানুষ দরিদ্র, বাদবাকিদের অনেকেরই নুন আনতে পান্তা ফুরায় দশা, সেই দেশের বাজারকে উন্মুক্ত করে দেয়ার চিন্তা করাটা শুধুমাত্র উন্মাদের পক্ষেই সম্ভব। এই উদ্ভট ও অসম্ভব একটি আদর্শকে গ্রহণ করে যে তারা ভালো করেননি, সেটি বেশ পরিষ্কারভাবেই বোঝা গেছে যখন বিগত সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে— মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাজারের নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে থাকে না! এই ডাহা মিথ্যে কথাটিও তাদের বলতে হয়েছে নিজেদের রক্ষা করার জন্য। কিন্তু সরকার নিজেই যখন এরকম একটি অসহায় অবস্থাকে মূর্ত করে তোলে তখন বাজার নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবসায়ী-লুটেরা-ফড়িয়ারা এই সুযোগ পুরোমাত্রায় গ্রহণ করে এবং এভাবেই তথাকথিত সিন্ডিকেটের জন্ম হয়! যাহোক, বুর্জোয়া দলগুলোর যেসব সীমাবদ্ধতা থাকে সেসব কারণেই বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় তাদের পক্ষে পুরোপুরিভাবে মুক্তবাজার অর্থনীতির বিরুদ্ধে যাওয়া সম্ভব নয়। (রাষ্ট্রক্ষমতায় যেতে পারলে বামদলগুলোর পক্ষে সেটি সম্ভব হলেও হতে পারে, কারণ আদর্শিকভাবেই তারা মুক্তবাজার অর্থনীতির বিরুদ্ধে)। সম্ভব না হলেও, এর বিশাল থাবা ও গ্রাসকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখার কোনো বিকল্প নেই। সেজন্য প্রয়োজন একটি কল্যাণমুখী অর্থনীতির আদর্শ ঘোষণা করা এবং সেই ঘোষণা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা। জনগণের মৌলিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকার বলে স্বীকৃত যেসব বিষয় আছে সেগুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব শুধুমাত্র সরকারী প্রচেষ্টায়ই। বাংলাদেশের এক বিপুল জনগোষ্ঠী গৃহহীন-ভূমিহীন-উদ্বাস্তু। নদীভাঙন বা এই ধরনের কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা মনুষ্যসৃষ্ট কোনো দুর্যোগের শিকার হয়ে এই মানুষগুলো ভিটেমাটি হারিয়ে শহরে এসে ভিড় জমায়। এতে করে শহরের ওপর যেমন চাপ পড়ে, তেমনি তাদের জীবনে নেমে আসে অকল্পনীয় বিপর্যয়। স্বাধীনতার পর থেকে এই ধরনের মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, অথচ কোনো সরকারই সমস্যাটির দিকে দৃষ্টিপাত করেনি; যদিও এর সমাধান করা অসম্ভব কিছু নয়। বাংলাদেশের যে বিপুল পরিমাণ খাসজমি আছে, যা বিভিন্ন তথাকথিত প্রভাবশালীদের দখলে রয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর, সেগুলো উদ্ধার করে যদি এর চারভাগের একভাগও গৃহহীন-ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা যায় তাহলে বাংলাদেশে কোনো উদ্বাস্তুই থাকবে না। তবে ভূমিহীনদের নাম করে সেগুলো যেন আবার টাউট-বাটপারদের দখলে চলে না যায়, সেটি নিশ্চিত করার দায়িত্বও সরকারেরই। প্রয়োজন হলে সরকার নিজ উদ্যোগে বণ্টনকৃত ওইসব জায়গায় ঘর তুলে দিয়ে ভূমিহীনদের দখল বুঝিয়ে দেবে। এতে করে সরকারের যে অর্থ ব্যয় হবে তা এই বিপুল মানবিক সমস্যা সমাধানের তুলনায় অতিশয় নগন্য। এই কাজটি করা কি অসম্ভব? ওই প্রভাবশালীরা কি সরকারের চেয়েও প্রভাবশালী? আসলে কোনো সরকারই ভূমি সংস্কারের কথা ভাবেনি, ভাবলে সম্ভব হতো। কিন্তু এরপরই প্রশ্ন আসবে, শুধু ঘর তুলে দিলেই চলবে? তারা খাবে কী? তাদের কর্মসংস্থানেরই বা কী ব্যবস্থা হবে? এই সমস্যাটিরও সমাধান অসম্ভব নয়। ওই খাসজমিগুলোর মধ্যে যেগুলো আবাদযোগ্য সেগুলো ভূমিহীনদেরকে চাষ করার জন্য শর্তসাপেক্ষে লিজ দেয়া যেতে পারে, এবং এই ক্ষেত্রে সরকারের কৃষিবিভাগ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। তারা সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদানের বিনিময়ে (যেমন বীজ-সার-সেচ ইত্যাদি) ফসলের অর্ধেকটা সরকারী গুদামে জমা করবে— অনেকটা সরকার ও ভূমিহীনদের মধ্যে আধাআধি বর্গা ব্যবস্থার মতো ব্যাপার। এবং যেহেতু সরকার একটি সমস্যার সমাধান করতে চাচ্ছে সেজন্য তাকেই উদ্যোগ নিতে হবে, এবং যাবতীয় সহায়তা প্রদান করতে হবে। এতে করে সরকারী গুদামেও বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য জমা হবে, যার ফলে সরকারের শস্যক্রয়-কর্মসূচির অর্থব্যয় কমে যাবে। আর যেসব খাসজমি আবাদযোগ্য নয় সেগুলোতে সরকারী উদ্যোগে শিল্প কল-কারখানা গড়ে তোলা যেতে পারে, অথবা দেশীয় উদ্যোক্তাদের মধ্যে শর্তসাপেক্ষে লিজ দেয়া যেতে পারে। সরকারের পক্ষ থেকে শর্ত থাকবে যে, লিজকৃত জমিতে শিল্প কল-কারখানা গড়ে তুলতে হবে, এর অন্যথা করা যাবে না এবং সেসব কলকারখানায় কর্ম-সংস্থানের ক্ষেত্রে ভূমিহীনরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। মাথা গোঁজার ঠাঁই আর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলে এই লোকগুলো নিশ্চয়ই 'ভাত দাও' বলে সরকারের কাছে ভিক্ষা চাইবে না। এখনো চায় না, তখন তো চাইবেই না। নিজেদের খাদ্য তারা নিজেরাই কিনে নেবে, নিজেদের কাপড়চোপড়ের ব্যবস্থাও নিজেরাই করবে। এমনকি সরকারী ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিকিৎসার জন্য ইতোমধ্যেই যে অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে তাকে কার্যকরী ও সচল করা গেলে দেশের অত্যন্ত ৭৫ ভাগ মানুষ— যারা সরকারী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও চিকিৎসা গ্রহণে ইচ্ছুক— এর সুবিধা লাভ করতে পারবে।

বলাবাহুল্য, কথাগুলো যতো সহজে বলা হলো, সেটি বাস্তবে পরিণত করা এরচেয়ে হাজার গুণ কঠিন। এটি একদিনের কাজও নয়। তবে উদ্যোগ নিলে অন্তত একযুগের মধ্যে নিশ্চয়ই এইসব মৌলিক সমস্যা সমাধান করে বিপুল মানবিক বিপর্যয় থেকে জাতিকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক তাঁর 'বাংলাদেশ : জাতির অবস্থা' বক্তৃতায় বাংলাদেশের দুটো জিনিসকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন এবং সেগুলোর যথাযথ ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। এগুলো হলো— জনগণ এবং পানিসম্পদ। জনসংখ্যাকে তিনি জনসম্পদে রূপান্তর করার কথা বলেছিলেন। এ পর্যন্ত আমরা তা করে উঠতে পারিনি, বরং ক্রমাগত প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দিয়ে, মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য করে তাদেরকে জাতির বোঝা হিসেবে চিহ্নিত করেছি।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে যেন আমরা এমন একটি দেশ দেখতে পারি যেখানে জনগণ আর বোঝা হিসেবে গণ্য হবে না, বরং পরিণত হবে সম্পদে, যাপন করবে একটি সম্মানজনক জীবন; রাষ্ট্র যেখানে নিপীড়কের ভূমিকা পালন করবে না, বরং পাশে এসে দাঁড়াবে বন্ধুর মতো; প্রভুদের হাতে দেশ ও জাতিকে ছেড়ে না দিয়ে রাষ্ট্র নিজেই হয়ে উঠবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কল্যাণকামী— রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে এই লক্ষ্যে কাজ শুরু করার জন্য আমরা নিশ্চয়ই এসব দাবি জানাতে পারি!

[রচনাকাল : জুন-আগস্ট, ২০০৭]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালির সংস্কৃতিচিন্তা

বাংলাদেশের মানুষের কাছে 'সংস্কৃতি' শব্দটি প্রায় বিমূর্ত রূপ ধারণ করেছে। শব্দটি বাংলা ভাষায় গৃহীত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত যতো বিভ্রান্তি ও তর্ক-বিতর্ক তৈরি করেছে, আর কোনো শব্দ তা করেছে বলে মনে হয় না। সংস্কৃতি বিষয়টি বোঝার জন্য যাদেরকে নিয়ে কথা বলা দরকার— অর্থাৎ দেশের জনগণ— তারা এখন পর্যন্ত জানতেই পারলো না, বুঝতেও পারলো না যে, ওই বস্তুটি কী! দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষাবঞ্চিত নিরক্ষর জনগণ তো বটেই, এমনকি বহু 'শিক্ষিত' লোককেও বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তিতে ভুগতে দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী এবং উচ্চতর পেশাগত মর্যাদায় অভিষিক্ত অনেক লোকও সংস্কৃতি বলতে কেবল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকেই বুঝে থাকেন! অর্থাৎ নাচ-গান-নাটক-চলচ্চিত্র-শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদিকেই সংস্কৃতি বলে মনে করেন। বলাবাহুল্য, এগুলো সংস্কৃতির অংশ বটে, তবে সংস্কৃতির পুরোটা নয়। 'সাংস্কৃতিক' শব্দটির সঙ্গে সংস্কৃতির মিল থাকায় এই বিপত্তি। এই বিভ্রান্তি ছড়ানোর পেছনে গণমাধ্যমের ভূমিকাও কম নয়। প্রতিদিন পত্রপত্রিকায় 'সংস্কৃতি সংবাদ' নামে যা কিছু ছাপা হয়, কিংবা টেলিভিশনের সংবাদে 'এ সপ্তাহের সংস্কৃতি' জাতীয় শিরোনামে যা কিছু প্রচারিত হয়, তা পড়ে বা দেখে মনেই হবে না যে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ছাড়া সংস্কৃতির অন্য কোনো অর্থ আছে! বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বিষয়টি নিয়ে মাথা-ই ঘামায় না; আর 'শিক্ষিত' লোকদের ধারণা এই রকম। অনেকে আবার বিষয়টিকে ধর্মবিরোধী বলেও মনে করেন (যেহেতু নাচ-গান ইত্যাদি ধর্মসম্মত নয়)। ধর্মও যে সংস্কৃতিরই অঙ্গ– এ কথা শুনলে সম্ভবত তাদের মাথায় বাজ পড়বে। বাংলাদেশে এই হলো সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা। তা, সংস্কৃতি-চেতনার এই করুণ হাল কেন? একটা কারণ হতে পারে— শব্দটি জনগণের পছন্দ হয়নি, কিংবা গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি, কিংবা বোধগম্য হয়নি। বাংলা ভাষায় শব্দটি চালু করার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন তাতে প্রাথমিকভাবে জয়ী হলেও শেষ বিচারে তাঁর এই বিজয়কে নিষ্ফলই বলতে হচ্ছে। অবশ্য সংস্কৃতির এই ধরনের ইন্টারপ্রিটেশনের জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও দায়ী করা চলে। কালচারের প্রতিশব্দ হিসেবে তিনি কৃষ্টিকে পছন্দ তো করেন-ই নি, বরং তীব্র বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন। কৃষ্টি যেহেতু কর্ষণ বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পর্কিত, এটা তাই তাঁর পছন্দ হয়নি, সংস্কৃতিকে তিনি নিয়েছিলেন সংস্কার অর্থে। অর্থাৎ মনের কর্ষণ নয়, সংস্কারই তাঁর পছন্দ ছিলো! এ থেকে তাঁর মনোজগতের কাঠামোটিও খানিকটা বুঝে নেয়া যায়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অনুষঙ্গ-উপকরণ আর প্রয়োজনকে তিনি সংস্কৃতির মর্যাদা দিতে চাননি— হয়তো এগুলোকে তিনি স্থূল হিসেবেই বিবেচনা করতেন; বরং শিল্পসাহিত্যের মতো সূক্ষ্মতম অনুভূতির চর্চাকে তিনি সংস্কৃতির মর্যাদা দিয়েছেন [সূত্র : *কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি*, নীহাররঞ্জন রায়]। 'কৃষ্টি'র বিরুদ্ধে এবং 'সংস্কৃতি'র পক্ষে তিনি কতোটা কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তার উদাহরণ হিসেবে তাঁর কয়েকটি পংক্তি বিচ্ছিন্নভাবে উল্লেখ করছি :

> কাল্‌চার শব্দের একটা নূতন বাংলা কথা হঠাৎ দেখা দিয়েছে; চোখে পড়েছে কি? কৃষ্টি? ইংরেজি শব্দটার আভিধানিক অর্থের বাধ্য অনুগত হয়ে ওই কুশ্রী শব্দটাকে কি সহ্য করতেই হবে? এঁটেল পোকা পশুর গায়ে যেমন কামড়ে ধরে, ভাষার গায়ে ওটাও তেমনি কামড়ে ধরেছে। মাতৃভাষার প্রতি দয়া করবে না তোমরা?... ইংরেজি ভাষার চাষ এবং ভব্যতা একই শব্দে চলে গেছে বলে কি আমরাও বাংলা ভাষায় ফিরিঙ্গিয়ানা করব? ইংরেজিতে সুশিক্ষিত মানুষকে বলে কালটিভেটেড– আমরা কি সেইরকম উঁচুদরের মানুষকে চাষ-করা মানুষ বলে সম্মান জানাব, অথবা বলব কেদারনাথ?...কালচারড ফ্যামিলিকে প্রকর্ষবান বললে সে পরিবার গৌরব বোধ করবে। কিন্তু কৃষ্টিমান বললে চন্দনের সাবান মেখে স্নান করতে ইচ্ছে করবে।...(সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা চিঠি থেকে, *পরিচয়*, মাঘ ১৩৩৯)।

সংস্কৃতি বলতে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন সেটাও বোঝা যাবে নিচের অংশটি পড়লে—

> ...আমাদের পেট ভরাবার জন্য, জীবনযাত্রার অভাব মোচন করবার জন্যে আছে নানা বিদ্যা, নানা চেষ্টা; মানুষের শূন্য ভরাবার জন্যে, তার মনের মানুষকে নানাভাবে নানা রসে জাগিয়ে রাখবার জন্যে আছে তার সাহিত্য, তার শিল্প। মানুষের ইতিহাসে এর স্থান কী বৃহৎ, এর পরিমাণ কী প্রভূত! সভ্যতার কোনো প্রলয়ভূমিকম্পে যদি এর বিলোপ সম্ভব হয়, তবে মানুষের ইতিহাসে কী প্রকাণ্ড শূন্যতা কালো মরুভূমির মতো ব্যাপ্ত হয়ে যাবে! তার 'কৃষ্টি'র ক্ষেত্র আছে তার চাষে-বাসে আপিসে-কারখানায়; তার সংস্কৃতির ক্ষেত্র সাহিত্য, এখানে তার আপনারই সংস্কৃতি, সেখানে তাতে আপনাকেই সম্যকরূপে করে তুলেছে, সে আপনিই হয়ে উঠেছে।... (সাহিত্যতত্ত্ব/সাহিত্যের পথে।)

বোঝাই যাচ্ছে, বাংলাদেশে সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে ধারণাটি প্রচলিত আছে তা আসলে রবীন্দ্র-কনসেপ্টেরই সম্প্রসারণ। আমরা যদি রবীন্দ্র-ভাবনাবিশ্ব থেকে বেরিয়ে আসতে চাই, তাহলে বাঙালির সংস্কৃতিকে বুঝে নেয়ার জন্য তাদের জীবনাচরণের প্রতিটি অনুষঙ্গ বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। অর্থাৎ বাঙালির খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-আশাক, আচার-আচরণ, সংস্কার, বিশ্বাস, ধর্ম, ধর্মবিশ্বাসের ধরন, ধর্মাচরণের ধরন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক, শিল্প-সাহিত্য এসবই আলাদাভাবে বিচার-বিবেচনার দাবি রাখে। তার আগে, সংস্কৃতি বলতে আমরা আসলে কী বুঝবো সেটা বলে নেয়া দরকার। সংস্কৃতি বিষয়টি, এমনকি শব্দটিও, যেহেতু বরাবর বিভ্রান্তি তৈরি করে এসেছে; এ সম্বন্ধে নিজের অবস্থানটি পরিষ্কার করার জন্যই একেকজন একেকটি সংজ্ঞাকে প্রমিত হিসেবে ধরে নেন। আমরাও একই কারণে সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রচলিত অন্তত কয়েকশ' মতের মধ্যে দুটোকে আমাদের মতের কাছাকাছি বলে গ্রহণ করতে পারি। একটি— culture is the man made part of the environment (হারস্কোভিটস)।

অধ্যাপক পবিত্র সরকার এটিকে ব্যখ্যা করেছেন এভাবে—

মানুষ আসার আগে পৃথিবী যে অবস্থায় ছিলো আর মানুষ আসার পর পৃথিবীর যে অবস্থা দাঁড়ালো এই দুইয়ের তফাত হলো সংস্কৃতির তফাত। পৃথিবীর জীবন প্রতিবেশে মানুষের সৃষ্ট যা কিছু সে সবই সংস্কৃতি বাকিটা প্রকৃতি। (সূত্র : *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি*, পবিত্র সরকার)।

এরকম আরেকটি সংজ্ঞাও নেয়া যায় :

Historically created designs for living, explicit and implicit, rational, irrational and nonrational which exist at any time as potential guides for the behaviour of men. (ক্লাইড ক্লাকহোন ও উইলিয়াম কেলি)

মানে দাঁড়ালো— ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্টি হওয়া জীবনযাপনের নানা ছক (ডিজাইন), যা কখনো প্রকাশ্য কখনো গোপন, কখনো যুক্তিসম্মত, কখনো অযৌক্তিক, কখনো যুক্তি নিরপেক্ষ (অর্থাৎ যেখানে যুক্তি-অযুক্তির প্রশ্ন তোলাই অবান্তর) এবং যা যে-কোনো সময়ে একটি জনগোষ্ঠীর আচরণকে পরিচালিত করে তা-ই হচ্ছে সংস্কৃতি। পবিত্র সরকার যুক্তিসম্মত উপকরণের উদাহরণ হিসেবে খাদ্য, পোশাক ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন, অযৌক্তিক উপাদান হলো ধর্ম বা সংস্কার-কুসংস্কার (যেহেতু এগুলো বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, যুক্তির ওপরে নয়), আর ভাষা হচ্ছে যুক্তিনিরপেক্ষ উপাদান।

অর্থাৎ, সংস্কৃতি বলতে একটি জাতির প্রতিটি অনুষঙ্গকেই বুঝবো আমরা— পোশাক-আশাক, পেশা, খাদ্যাভ্যাস, ঘর-বাড়ির প্যাটার্ন থেকে শুরু করে তার বিশ্বাস-অবিশ্বাস-সংস্কার-কুসংস্কার ইত্যাদি সবই সংস্কৃতির অঙ্গ।

অবশ্য এই চিন্তাটি নতুন কিছু নয়। রবীন্দ্রোত্তরকালে, এমনকি তাঁর জীবদ্দশায়ই বুদ্ধিজীবীরা তাঁর ভাবনাবিশ্ব থেকে বেরিয়ে এসে সংস্কৃতিকে সামগ্রিক জীবনাচরণ হিসেবে মেনে নিয়েই এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে থাকেন। ৪০-দশকের গোড়ার দিকে (এপ্রিল, ১৯৪১) বিনয়কুমার সরকার 'বেঙ্গলি কালচার অ্যাজ এ সিস্টেম অব মিউচ্যুয়াল আককুলটুরেশনস' শিরোনামে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, সেটি বাঙালির সংস্কৃতি সম্বন্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়। গোপাল হালদার, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী মোতাহার হোসেন, নিহাররঞ্জন রায় প্রমুখের রচনায় এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব চোখে পড়ে। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে :

> কালচার, কৃষ্টি, সংস্কৃতি এইসব শব্দ যে ধ্যানধারনার মূর্ত রূপ তা জীবনের কোনও আংশিক কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের ধ্যানধারণা নয়, বরং জীবনের সমগ্র কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের আশ্রয়ে জাত ও বর্ধিত। (সূত্র : *কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি*, নীহাররঞ্জন রায়।)

গোপাল হালদার মনে করেন— সংস্কৃতির তিনটি অবয়ব বা তিন ধরনের অবলম্বন আছে— ১. জীবন সংগ্রামের বাস্তব উপকরণসমূহ (material means) ২. সমাজ যাত্রার বাস্তব ব্যবস্থা (social structure), এবং ৩. মানস-সম্পদ। তিনি সমাজ যাত্রার বাস্তব ব্যবস্থাকে সংস্কৃতির প্রধান আশ্রয় এবং মানস-সম্পদকে সমাজের ওপরতলার উপকরণ (superstructure) হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছেন—

> সংস্কৃতি বলতে যে শুধু ঘরবাড়ি, ধন-দৌলত বুঝায় তাহা নয়। শুধু যে রীতি-নীতি, আচার অনুষ্ঠান বুঝায় তাহাও নয়। সংস্কৃতি বলিতে মানস-সম্পদও বুঝায়— চিন্তা, কল্পনা, দর্শন, ধ্যান-ধারণা, এই সবও বুঝায়... আসলে বাস্তব ও মানসিক সমস্ত 'কৃতি' বা সৃষ্টি লইয়াই সংস্কৃতি— মানুষের জীবন-সংগ্রামের মোট প্রচেষ্টার এই নাম। ... সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কালচার জাতিগত, দেশগত বা ধর্মগত তাহা যেমন অর্ধসত্য, তেমনি সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কালচার অর্থ কাব্য, গান, চারুকলা, বড় জোর দর্শন বা বিজ্ঞান পর্যন্ত, তাহাও তেমনি আর একটি অর্ধসত্য। কথা এই যে, সংস্কৃতি সমাজ-দেহের শুধু লাবণ্যছটা নয়, তাহার সমগ্র রূপ। তাই সমাজের পরিচয় দিয়াই সংস্কৃতির পরিচয়। (সূত্র : *সংস্কৃতির রূপান্তর*, গোপাল হালদার।)

গোপাল হালদার তিনটি বিষয়কে সংস্কৃতির প্রধান সত্য হিসেবে অভিহিত করেছেন— ফ্রিডম অব মাইন্ড (মনের স্বাধীনতা), ইউনিভার্সালিজম (বিশ্বমানবতা), এবং আর্বানিটি (নাগরিক শালীনতা)। সাধারণভাবে এই হলো সংস্কৃতির সদর্থ। কিন্তু তিনি মনে করেন— আর একটি বিষয়ও এর সঙ্গে যোগ করতে হবে। সেটি হচ্ছে— ক্রিয়েটিভনেস বা সৃষ্টিশীলতা। 'শুধু জানলে আর বুঝলেই মানুষের জীবনধর্ম শেষ হয়ে যায় না— তাকে কিছু করতে হয়, গড়তে হয়, সৃষ্টি করতে হয়।'

পবিত্র সরকার মনে করেন— সংস্কৃতির দুটো প্রধান ভাগ। বস্তুগত এবং অবস্তুগত (অ্যাবস্ট্রাক্ট)। প্রথম ভাগে পড়ে মানুষের জীবনে ব্যবহৃত যাবতীয় নিত্যব্যবহার্য বস্তুসামগ্রী আর দ্বিতীয় ভাগে পড়ে মানুষের যুক্তিসম্মত চিন্তা ও সিদ্ধান্ত, বিশ্বাস ও সংস্কার, সুন্দর ও অসুন্দরের কল্পনা। আর এই সমস্তকিছুই যদি সমান ও সংগতভাবে একটি জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে যায়, তাকেই বলা যায় সুস্থ সংস্কৃতি। এর বিপরীতে আছে অপসংস্কৃতি— যা অসাম্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অন্যদিকে লোকসংস্কৃতিকে অনাগরিক সংস্কৃতি নাম দিয়ে এর প্রধান লক্ষণ হিসেবে তিনি এর উপাদান সমূহে 'সামাজিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালিকানাকে' চিহ্নিত করেছেন। (সূত্র : *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি*, পবিত্র সরকার)।

আবার আবদুল মতীনের মতে— সংস্কৃতির গোড়ার কথাটি হলো মূল্যবোধ। মূল্যবোধ দু-ধরনের হতে পারে— ব্যক্তিগত ও সামাজিক। ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ব্যক্তির নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ ও অভিরুচির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সামাজিক মূল্যবোধগুলো ব্যক্তির পছন্দ হোক আর না হোক, সংস্কৃতিবান হতে হলে তাকে মানতেই হবে। সামাজিক মূল্যবোধগুলোর কেন্দ্রে আছে নৈতিকতা ও যুক্তিবাদিতা। প্রথমটির তাৎপর্য ব্যবহারিক, দ্বিতীয়টির তত্ত্বীয়। নৈতিকতাকে ঘিরে 'যথার্থ' মানুষের যে সংস্কৃতি, তিনি তাকে বলেছেন 'মৌল সংস্কৃতি', আর যুক্তিবাদকে ঘিরে যে সংস্কৃতি তার নাম দিয়েছেন 'উচ্চতর সংস্কৃতি' বা 'শৌখিন সংস্কৃতি'। সব মানুষের ভেতরেই কম-বেশি মৌল সংস্কৃতির দেখা মেলে, অন্যদিকে শৌখিন সংস্কৃতির চর্চা করেন সমাজের গুটিকয় মানুষ। শৌখিন সংস্কৃতিকে অধিকাংশ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়াটাই কল্যাণকামী মানুষের প্রধান একটি কাজ। (সূত্র : *সংস্কৃতির সন্ধানে*, আবদুল মতীন।)

২

শুধু সংস্কৃতিই নয়, এই শব্দটির গায়ে গায়ে লেগে আছে অন্য যে শব্দ দুটো— লোকসংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি— আমাদের চিন্তাবিদেরা সেসব নিয়েও খোলামেলা কথা বলেছেন।

পবিত্র সরকার তাঁর 'লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব' শিরোনামের চমৎকার রচনাটিতে লোকজীবনের নিজস্ব নন্দনতত্ত্বের দিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন— শিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর বা লোকজীবনের নন্দনতত্ত্ব মেলে না— মেলার কথাও নয়। কিন্তু 'ভদ্রসমাজ' লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান— লোকগান, লোকছড়া, ধাঁধা, হেঁয়ালি, প্রবাদ ইত্যাদি নিজ সমাজে উপস্থাপন করার সময় তাদের নিজস্ব নন্দনতত্ত্বের সাহায্যে সেগুলোর শিল্পমূল্য নির্ধারণ করতে চান। এ কাজটি অসঙ্গত— কারণ লোকসংস্কৃতির এসব উপকরণ শুধু সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্যই রচিত হয় না, তার আরও বহুবিধ ব্যবহারিক মূল্য থাকে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীও শহুরে-শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর দ্বারা লোকসংস্কৃতি-চর্চার বিরোধিতা করে বলেছেন— এই ধরনের চর্চা প্রতারণামূলক। সাধারণ মানুষের প্রতি ভালোবাসা থেকে তা করা হয় না, যেহেতু তাদের সঙ্গে এই শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক এমন কিছু সৌহার্দ্যপূর্ণ নয়। তবে সামগ্রিকভাবে লোকসংস্কৃতির ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক। তিনি মনে করেন, লোকসংস্কৃতির জগৎ হচ্ছে ভীতি ও বেদনার জগৎ, এই জগৎ ক্ষুদ্র, স্বাস্থ্যহীন ও অনুজ্জ্বল। এর সমাজতাত্ত্বিক মূল্য থাকলেও শিল্পমূল্য সামান্য— একে টিকিয়ে রাখা বা গৌরাবান্বিত করা পেছনে হাঁটারই নামান্তর। (সূত্র : *লোকসংস্কৃতির ভদ্রচর্চা*, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।)

অন্যদিকে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় উপনিষদ থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখিয়েছেন— লোকসংস্কৃতির ধারাটি পুরাণের চেয়ে পুরনো এবং লোকসংস্কৃতির যে মূল উপাদান— নৈরাত্মবাদ— তারই প্রাচীন নাম লোকায়ত দর্শন। লোকায়তিকদের কাছে সুস্পষ্টভাবে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়গুলোই শুধু সত্য— যেমন অর্থ ও কাম— পরকাল/পরলোক/আত্মা/স্বর্গ-নরক ইত্যাদি কাল্পনিক বিষয়ে তাদের আস্থা নেই। লোকায়ত দর্শন কেবল 'কৌতূহল নিবৃত্তির ব্যাপার নয়', জনগণের 'মতাদর্শগত সংগ্রামের অস্ত্রও' বটে— যার আধুনিক নাম বস্তুবাদ। (সূত্র : *লোকসংস্কৃতি ও লোকায়ত দর্শন*, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

দিব্যজ্যোতি মজুমদার অবশ্য মনে করেন— লোকসংস্কৃতির উদ্ভব শুধু গ্রামীণজীবনেই সীমাবদ্ধ নয়, মানুষ যেখানে বেঁচে রয়েছে, উত্তরপুরুষকে কিছু দিয়ে যাবার প্রবণতা যেখানে রয়েছে, সেই ভূমিই লোকসংস্কৃতির উর্বরক্ষেত্র। সেটা গ্রাম বা শহর যে কোনোকিছুই হতে পারে। লেখক উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন— এমনকি দেশান্তরি হলেও লোকসংস্কৃতির মূল ঐতিহ্যের মৃত্যু ঘটেনি। কেবল সমগ্র জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করার মাধ্যমেই লোকসংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটানো সম্ভব। (সূত্র : *লোকসংস্কৃতির ভবিষ্যৎ : কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা*, দিব্যজ্যোতি মজুমদার।)

প্রায় পরস্পরবিরোধী এইসব মতামতকে গ্রাহ্যের মধ্যে এনে লোকসংস্কৃতিকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়? অস্বীকার করার উপায় নেই যে, লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান-উপকরণ-অনুষঙ্গ যেমন লোককাহিনী, লোকগান, লোকছড়া, লোককথা, লোকগাথা, রূপকথা, প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা— এসবই শুনতে ভালো লাগে, পড়তে ভালো লাগে, বলতেও ভালো লাগে। শ্রেণী-পেশা-বয়স নির্বিশেষে এমন কোনো মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যিনি এগুলো পছন্দ করেন না। বিশুদ্ধ বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে লোকসংস্কৃতির তাই একটি গুরুত্ব আছে। কিন্তু এটিই এর একমাত্র গুরুত্ব নয়, নানা কারণেই এগুলো আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে হাজির হয়। এর একটি হলো— লোকজীবনের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটে এসব কাহিনী ও গল্পে, গানে ও ছড়ায়। যে-কোনো দেশের লোককাহিনী আসলে ওই দেশের লোকজীবন রচিত আকাঙ্ক্ষার গল্প। একথা সবাই জানেন যে, এসব রচনার কোনো সুনির্দিষ্ট রচয়িতা নেই। দারিদ্রক্লিষ্ট, সংকট ও সমস্যাবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্ত যে জনগোষ্ঠী তাদেরই মুখে মুখে রচিত হয় এসবকিছু, আর লোকমুখে যুগের পর যুগ ধরে তা প্রবাহিত হতে থাকে। এই প্রবাহমানতাই জনজীবনের কাছে এসবকিছুর গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করে। আবার কোনো সুনির্দিষ্ট রচয়িতা নেই বলে এগুলো সামাজিক সম্পত্তি হিসেবেই বিবেচিত হয়। নাগরিক সাহিত্য-পরিমণ্ডলে সাহিত্যের ওপর লেখকের স্বত্ত্ব থাকে, এগুলো তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অন্য কারো অধিকার নেই এসব রচনার পরিমার্জনের— কিন্তু লোককাহিনীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি উল্টো। মানুষের মুখ থেকে মুখে ঘুরে ফেরার সময় অনিবার্যভাবেই এ কাহিনীগুলোর রূপ পাল্টায়, পরিবর্ধন ঘটে, পরিমার্জনও; কখনো বা সময়ের প্রয়োজনে একই গল্পের মধ্যে নতুন বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ঘটে— এবং যেহেতু এগুলো সামাজিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পত্তি, এসব পরিবর্তনে তাই কারো কোনো আপত্তি থাকে না, থাকলেও খাটে না। কিন্তু কেনই বা এসব গল্প এত দীর্ঘকাল ধরে জনজীবনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় বা টিকে থাকে? এর একটি কারণ, আগেই বলা হয়েছে— এগুলোর ভিতর দিয়ে লোকজীবনের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটে। লোককাহিনীর জগৎ এক অর্থে জনগণের ফ্যান্টাসির জগৎ। এখানে অহরহ দেখা মেলে দৈত্য-দানবের, ভূত-পেত্নীর, জ্বীন-পরীর, রাজপুত্র-রাজকন্যাদের। এসব দৈত্যরা আবার নিজেদের প্রায় অসীম শক্তিমত্তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের বুদ্ধিমত্তার কাছে পরাজিত হয়, পরীরা হয় সহযোগিতাপ্রবণ আর রাজপুত্ররা প্রায় সাধারণ মানুষের মতোই সমস্যা-সংকটে জর্জরিত, এসব সংকট উত্তরণে সাধারণ মানুষদের নানারকম সহযোগিতা তাদের প্রয়োজন হয়। বলাইবাহুল্য, যারা এসব গল্পের রচয়িতা– এ আসলে তাদের আকাঙ্ক্ষারই প্রকাশ, আর প্রায় সমাধানহীন সমস্যা-সংকটগুলোর সমাধান তারা করে এসব ফ্যান্টাসির মাধ্যমে। কিন্তু এ ছাড়াও লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানের— লোককথা, লোকছড়া, গান, প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা ইত্যাদির— আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যও থাকে। এসবকিছুর মধ্যে এর রচয়িতারা পরবর্তী প্রজন্মসমূহের জন্য রেখে যান নানারকম প্রয়োজনীয় ও শিক্ষণীয় উপাদান। সমাজে প্রচলিত নানা ধরনের সংস্কার-বিশ্বাস-মূল্যবোধ-নীতিবোধ-ঔচিত্যবোধ ইত্যাদি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হয় এসবের মাধ্যমে। এই অর্থে লোকসংস্কৃতি সামাজিক-শিক্ষকের ভূমিকাও পালন করে। মনে রাখা দরকার— এগুলোর জন্ম এমন এক সমাজে যেখানে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয় কোনোকিছু রেখে যাবার আধুনিক কোনো পথই খোলা ছিলো না। শুধু তাই নয়, লোকসংস্কৃতি থেকে যে কেউ অন্তত আরো দুটো বিষয় খুঁজে নিতে পারেন— সাধারণ মানুষের কল্পনা প্রতিভা ও তাদের দার্শনিকতা। যে অসামান্য কল্পনা প্রতিভা দিয়ে রূপকথাগুলো রচিত, তা সম্ভবত একজন আধুনিকতম লেখকেরও থাকে না। অন্যদিকে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে নানা দার্শনিক উপলব্ধির প্রকাশও ঘটে এসবকিছুতে। কিন্তু লোকসংস্কৃতির এতসব ভূমিকা খুঁজে দেখেন নাগরিক ও শিক্ষিত জনগণ। যারা এসব রচনা করেন, উপভোগ করেন— তারা যদি বলেন, নিছক আনন্দের জন্যই এসবকিছুর সৃষ্টি, সম্ভবত সেটাই হবে এসব রচনা সম্বন্ধে সবচেয়ে সঠিক কথা। যে জীবন দারিদ্র, দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, সমস্যা ও সংকটে পূর্ণ, যে জীবন পরিবর্তনহীন, প্রায় স্থবির, যে জীবনে আনন্দের বহুবিধ আধুনিক উপকরণ ছড়ানো নেই— সে জীবনে লোকসংস্কৃতির এসব উপাদানের ভূমিকা যদি হয় নিছক আনন্দদান, তাহলে বলতেই হয়, লোকসংস্কৃতি মহান— কারণ একটি দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে সে আনন্দ দিতে পারে, অন্য কোনোকিছুই যা পারে না। প্রকৃতপক্ষে লোকসংস্কৃতি তা-ই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনায় 'অপসংস্কৃতি' এক অনিবার্য প্রসঙ্গ। এ সম্বন্ধেও আমাদের চিন্তাবিদরা বহুমাত্রিক ভাবনা-চিন্তার সাক্ষর রেখেছেন। অন্যান্য বিষয়ের মতো অপসংস্কৃতি সম্বন্ধেও পবিত্র সরকারের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—

> যা জীবনকে সুস্থ বিকাশের দিকে এগিয়ে দেয়, সামগ্রিকভাবে সমাজের এবং ব্যক্তির জীবন ও মননের পুষ্টিতে সাহায্য করে, তাই সুস্থ সংস্কৃতি। সংস্কৃতির উপাদান-উপকরণগুলো সমান ও সংগতভাবে সবার কাছে পৌঁছে যাবে, সুস্থ সংস্কৃতির ধারণাটি এই আদর্শের সঙ্গে যুক্ত। সমাজের ক্ষমতা, সম্পদ ও ভোগ্যপণ্য বন্টনের অসাম্যই অপসংস্কৃতি।... অপসংস্কৃতি এক ধরনের পরিবেশ দূষণ। কফ থুতু মলমূত্রে রাস্তাঘাট নোংরা করা, বা গালিগালাজ করা যেমন অপসংস্কৃতি, ঘুষ নেওয়াও তেমনই, পরীক্ষায় টোকাটুকিও নিশ্চয়ই আর এক ধরনের অপসংস্কৃতি। কিন্তু সাধারণভাবে আমরা অপসংস্কৃতি বলতে বুঝি শিল্পের কুশ্রীতা, মানুষের আদিম লোভ, হিংস্রতা ও কামনাকে উদবেজিত করার লক্ষ্য নিয়ে সংস্কৃতিবস্তুর সচেতন পরিকল্পনা ও বিন্যাস।... অপসংস্কৃতির তিনটি বড়ো জায়গা চিহ্নিত করতে পারি আমরা। প্রথমত আমাদের বিনোদনের উপাদানগুলিতে, দ্বিতীয়ত আমাদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, তৃতীয়ত আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত ব্যবহার ও প্রথাত্বে— অপসংস্কৃতির লক্ষণ সবচেয়ে বেশি করে ধরা পড়েছে। (সূত্র : *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি*, পবিত্র সরকার)।

অন্যদিকে সুকুমারী ভট্টাচার্য মনে করেন— সংস্কৃতি মানে যদি হয় নিজেকে সংস্কার করা, তাহলে অপসংস্কৃতি হলো— সমাজের জন্য, সভ্যতা ও প্রগতির জন্য ক্ষতিকর এমন কোনোকিছুকে প্রশ্রয় দেয়া বা তাকে আঁকড়ে থাকা বা তাকে সমাজ থেকে জঞ্জালের মতো ঝেড়ে না ফেলা। অপসংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে কতোগুলো নতুন ও মূল্যবান বিবেচনা দাঁড় করিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে— অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে যারা সোচ্চার তারা শুধুমাত্র পাশ্চাত্য-প্রভাবিত নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা, যৌনসম্পর্ক, পোশাক-আশাক নাচ-গান ইত্যাদি নিয়েই কথা বলেন। অথচ এই দেশে-সমাজে বিষবৃক্ষের মতো বাড়তে থাকা সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ, নারীর প্রতি অবমাননা ও অত্যাচার, নারী-পুরুষে সীমাহীন বৈষম্য— সমাজ ও প্রগতির জন্য ক্ষতিকর এসব বিষয়ও সযত্নে এড়িয়ে যান। তিনি এগুলোকেই অপসংস্কৃতি হিসেবে চিহ্নিত করে এগুলোর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন।

এ সম্বন্ধে অন্নদা শংকর রায়ের মতামতটিও কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি মনে করেন— অপসংস্কৃতি নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য কারো কাছে সাহায্যের হাত পাতে না, সরকার কিংবা ধনবান ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতার ধার ধারে না— কারণ সে স্বাবলম্বী। আর এর জোর হচ্ছে জনতার আগ্রহ। জনগণ যেমনটি চায়, অপসংস্কৃতি নিজেকে সেভাবেই তৈরি করে। আর তাই জনগণের আগ্রহ যেহেতু রাতারাতি শেষ হয়ে যায় না, অপসংস্কৃতিও সহসা বিলীন হওয়ার কারণ নেই। অপসংস্কৃতি রোধ করার জন্য প্রয়োজন জনতার রুচি পরিবর্তন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনায় লেখকরা সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্ম, সভ্যতা, গণতন্ত্র, সমকাল ইত্যাদি নানা বিষয়ের সম্পর্ক নির্ণয়েও গুরুত্বপূর্ণ মত রেখেছেন। এসব বিষয়ে পরস্পরবিরোধী মতও লক্ষ্য করা গেছে। যেমন কেউ কেউ ধর্মকে সংস্কৃতির অংশ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, কেউ কেউ আবার ধর্মকে দেখেছেন সংস্কৃতিবিরোধী বিষয় হিসেবে।

ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্পর্ক সম্বন্ধে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মত হচ্ছে— এ দুটো বিষয় পরস্পরবিরোধী। কারণ, ধর্ম ও এর নিয়মকানুন-বিধিবিধান সুনির্দিষ্ট, অনড় এবং অপরিবর্তনীয়। অন্যদিকে সংস্কৃতি প্রবহমান ও প্রসারণশীল। এদের মধ্যে তাই আপস হতে পারে না, তবে একটা রফা হতে পারে এই যে, যে যার মতো চলবে– কেউ কারো জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। 'সংস্কৃতি চলতে চায়, বাড়তে চায়, অগ্রসর হতে চায়।...সংস্কৃতি অর্থ সুন্দর, সুষম জীবনচর্চা।' যা কিছু জীবনের সুস্থ-সুন্দর বিকাশে সহায়তা করবে তার সঙ্গে সংস্কৃতির বিরোধ নেই; বরং সংস্কৃতি তা গ্রহণ করবে— হোক তা দেশী বা বিদেশী ভাবধারা বা রীতিনীতি। এই গ্রহণ ধর্মের কাছ থেকেও হতে পারে, আর ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্কও এটুকুই। (সূত্র : *ধর্ম ও সংস্কৃতি*, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী।)

গোপাল হালদারও মনে করেন: ধর্ম কখনো সংস্কৃতির ভিত্তি হতে পারে না। কারণ সংস্কৃতি হলো চিরপরিবর্তনীয়, চিরবিকাশশীল সর্বব্যাপক— তার বনিয়াদ বাস্তবক্ষেত্রে জীবনযাত্রা; সেই জীবনের তাগিদেই সে আচার-অনুষ্ঠান গড়ে, ভাঙে, বদলায়, সে মানবসম্পদও রচনা করে, বর্জন করে, সৃষ্টি করে। অর্থাৎ সংস্কৃতি গতিধর্মী এবং সৃষ্টিশীল। অন্যদিকে ধর্ম হলো স্থিতিধর্মী, তার লক্ষ্য সৃষ্টি নয়, স্থায়ীত্ব। ধর্ম চায় জগৎ ও জীবনবোধকে চিরন্তন করে রাখতে। ধর্ম তাই সংস্কৃতির অঙ্গ বটে, ভিত্তি নয়।

শুধু সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্মাণই নয়, বাঙালির সংস্কৃতি, বাংলার সংস্কৃতি এবং কখনো সর্বভারতীয় সংস্কৃতি নিয়েও বিশদভাবে আলোচনা করেছেন বাঙালিরা চিন্তাবিদরা। বাঙালি সংস্কৃতির আলোচনায় যেমন একটি সমন্বিত রূপ খোঁজার চেষ্টা হয়েছে, সেইসঙ্গে অনিবার্যভাবে এসেছে ধর্মের প্রসঙ্গ, বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও ঐক্যের প্রসঙ্গও। অর্থাৎ অস্বস্তিকর বিষয়গুলো 'অস্বস্তিকর' হিসেবে সরিয়ে না রেখে সেগুলো আগাগোড়া বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরা, বিরোধের কারণ সন্ধান করেছেন, ঐক্যের সম্ভাবনা ও ঐতিহ্য নিয়ে কথা বলেছেন। পরস্পর-বিরোধী বক্তব্যও পাওয়া গেছে অনেক। বাঙালি সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধানে কেউ বিরোধের বিষয়টিকে প্রকট করে তুলেছেন, কেউ আবার বিরোধ স্বত্ত্বেও ঐক্যের বিষয়গুলোর ওপর জোর দিয়েছেন।

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে গোপাল হালদারের 'ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা : আদিরূপ' এবং 'ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা : প্রাচীন ও মধ্যরূপ' রচনা দুটোতে। প্রচুর তথ্য ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন— প্রাচীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারত একান্তভাবেই কৃষিজীবী ছিলো। এ-ধরনের সমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো— প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা। ফলে ভারতীয় সাহিত্যে, দর্শনে বা মানসজগতে আত্মপ্রত্যয় নেই— আছে অদৃষ্টবাদ, ভাববাদ ও সহজ সমর্পণ। প্রাচীন ভারতের এই কৃষিজীবী সংস্কৃতি দীর্ঘকাল তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই টিকে ছিলো। প্রাচীন ও মধ্যরূপ আলোচনার জন্য তিনি খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে মুসলিম শাসনের শেষ পর্যন্ত (১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ) সময়টিকে বেছে নিয়েছেন। দেখিয়েছেন— এই দীর্ঘ কালখণ্ডে ভারতীয় জীবনধারা মোটামুটি একই খাতে প্রবাহিত হয়েছে। রাজা বদলেছে, রাজ্য বদলেছে, সমাজ বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে মানুষের জীবনে বহু ধরনের পরিবর্তন এসেছে কিন্তু কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। এই সময়ে এককেন্দ্রিক কোনো রাষ্ট্র না থাকলেও একটি সাংস্কৃতিক ভাবধারার ঐক্য ও আচার-বিচারের ধারণা প্রচলিত ছিলো। যেহেতু ভারতীয় সভ্যতার আর্থিক বুনিয়াদ ছিলো কৃষি— তাই রাজা ও রাজ্যের পরিবর্তন সত্ত্বেও পল্লীসমাজ অটুট থেকেছে। ভারতের যাবতীয় বৈচিত্র্যময় বিকাশের মূলে আছে কৃষিসভ্যতা, ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক কারণেই ভারতীয় জনগণের ছিলো এক স্বচ্ছন্দ, স্বতন্ত্র আর্থিক জীবনযাত্রা। এর সঙ্গে বহিরাগত বিভিন্ন জাতির জীবন ও চিন্তাধারা মেশার ফলে বহুবিচিত্র সংস্কৃতির মিলনে গড়ে উঠেছে ভারতের ইতিহাস। নদীমাতৃক ভারতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য কৃষিজীবীদের জন্য এক বিরাট সুবিধা, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অধিবাসীরা পোশাকের ব্যাপারেও প্রকৃতির কাছ থেকে অযাচিত সুবিধা পায়। অর্থাৎ এখানে জীবনযুদ্ধে মানুষের সহজ জয় হয়, আর এই জয়ে জোটে বিশ্রাম ও অবকাশ। এই সুবিধা পাওয়ার ফলে তাদের মধ্যে সহজ জীবিকার জন্য উদ্যমহীনতা ও বিকাশের মন্থরতা দেখা যায়। আর অবকাশভোগী সমাজে অনিবার্যভাবে বাস্তবের চেয়েও কল্পনা বড় হয়ে ওঠে, ভাববাদিতার প্রতি শ্রদ্ধা জাগে বেশি। এর প্রভাব পড়ে বহিরাগত আর্যদের ওপরও। আর্যরা একটিমাত্র গোষ্ঠী নয়, তাদের সভ্যতাও সমস্ত রের ছিলো না, তবে তারা এক ধর্ম ও সংস্কৃতি মানতো। হিন্দুসভ্যতা নিছক আর্যসভ্যতা নয়– এদেশে আসার পর আদিবাসী দ্রাবিড়, কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এক নতুন আর্য-সংস্কৃতির জন্ম হয়। প্রাচীন আর্যরা প্রবল ও দুর্ধর্ষ মানুষ— যুদ্ধজয় ও শত্রুনাশ তাদের প্রধান সাধনা। খাদ্য-পানীয়-নৃত্য-ক্রীড়া— এসবেই তাদের উৎসাহ, চিন্তা-ধ্যান-বৈরাগ্য তাদের ধর্ম নয়। তবু ভারতীয় প্রকৃতির প্রভাবে তাদের মধ্যে এক মানসিক প্রকর্ষের সৃষ্টি হলো, আর এর পেছনে ছিলো ভাববাদিতা, যা পরিশেষে হিন্দু-আধ্যাত্মিকতায় পরিণত হয়। এর ফল পুরোপুরি ইতিবাচক হয়নি। কারণ— কায়িক শ্রম ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে অপমানজনক বিষয় হিসেবে গণ্য হতে থাকে, এবং বস্তুবিমুখ চিন্তার প্রসার, ভাববাদ ইত্যাদিই একমাত্র সত্য বলে গৃহীত হয়। এর মধ্যেই জন্ম নেয় বৌদ্ধধর্ম– নির্বাণবাদ যার প্রধান স্তম্ভ। নির্বাণবাদ বস্তুবাদ নয়, জীবনবাদও নয়। নির্বাণকেই যারা জীবনযন্ত্রণার চরম অবসান বলে মনে করে, জীবনের প্রতি তাদের মমতা থাকার কথা নয়। তবে শ্রেণীবিভক্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল বলে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। এই ধর্মকে কেন্দ্র করে একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র গঠনেরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেষ্টা চলেছিল। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধধর্মই ভারতকে পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত করে দেয়, এর একটি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিও ছিলো। এরপর আসে মুসলিম জনগোষ্ঠী। তবে রাষ্ট্রজয়ের পরও তাদের সংস্কৃতি সর্বতোভাবে গৃহীত হয়নি ভারতীয় জনগণের কাছে। শাসকদের প্রভাবে সমাজগত বড় কোনো পরিবর্তন না এলেও পরিবর্তন এসেছে অন্যভাবে। নিপীড়িত জনগণের কাছে ইসলামের শান্তি-সাম্যের বাণী বিপুলভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, জন্ম নিয়েছে নতুন ভাষা— উর্দু, নতুন ধরনের আদব-কায়দা, পোশাক-আশাক, নতুন ধরনের নিত্যসামগ্রীর প্রচলন। এই দীর্ঘসময়ে বহিরাগতদের দ্বারা ভারত আক্রান্ত হওয়ার ফলে এককেন্দ্রিক সাম্রাজ্য গঠন সম্ভব হয়নি। ফলে ভারতবাসী এক রাষ্ট্রজাতি বা নেশন হতে পারেনি, ভারত হয়ে আছে বহুজাতির দেশ ও সমাজ।

বাঙালি সংস্কৃতিকে ভারতীয় সংস্কৃতিরই একটি বিশেষ ধারা উল্লেখ করে গোপাল হালদার তাঁর 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপরেখা' রচনায় বলেছেন: এর নিজস্ব একটি রূপ ও বৈশিষ্ট্য ছিলো এবং আছে, আর তা গড়ে উঠেছিল মূলত বাংলাভাষাকে কেন্দ্র করে। এই সংস্কৃতির স্বরূপ আলোচনার জন্য তিনি একহাজার বছর সময়কালকে তিন ভাগে ভাগ করে বলেছেন— পূর্বযুগে এ অঞ্চলে ব্রত, পার্বণ, মন্ত্রতন্ত্র ও ঝাঁড়ফুকের খুব প্রসার ছিলো, জীবনযাত্রা ছিলো কৃষিপ্রধান। মধ্যযুগে বৈষ্ণব ও ইসলাম ধর্মের প্রভাবে বাঙালি সংস্কৃতির রূপ বদলে যেতে থাকে। এ সময়ে ব্যাপকভাবে সাহিত্য-সঙ্গীত ও লোকসংস্কৃতির চর্চা হতে থাকে এবং এতে শাসকশ্রেণীর ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা ছিলো। আধুনিক কালের সংস্কৃতি মূলত পরাধীন জাতির সংস্কৃতি যা ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের চিহ্ন বয়ে চলেছে। এই সময়েই মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরি হয় এবং তাদের দ্বারা সৃষ্ট 'ভদ্রলোকের সংস্কৃতি' বিপুল জনগোষ্ঠীর 'লোকসংস্কৃতি'র সঙ্গে সংযোগ ও সম্পর্কবিহীন হয়ে পড়ে।

৫

বাঙালীর সংস্কৃতি সংক্রান্ত আলোচনায় একটি অনিবার্য বিষয় হিসেবে এসেছে মুসলমান জনগোষ্ঠীর প্রসঙ্গ। যেহেতু মুসলমানরা বহুদিন পর্যন্ত নিজেদের বাঙালি বলে মনেই করতো না, আবার হিন্দুরাও মুসলমানদেরকে কখনো বাঙালি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেনি, তাই চিন্তাবিদেরা তাঁদের এ সংক্রান্ত লেখায় মূলত এই ধারণাগুলোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। মুসলিম সংস্কৃতির চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য, মুসলমানদের বাঙালিত্ব, হিন্দু-মুসলিম বিরোধ ইত্যাদি নিয়েও খোলামেলা কথা বলেছেন তাঁরা।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আমাদের জানাচ্ছেন : মুসলমানরা এদেশে এসেছিল জয়ী হতেই, কিন্তু নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি এদেশের ওপর চাপিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়ে নিজেরাই বাঙালি হয়ে গেছে। বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতিতে মুসলমানদের বয়ে আনা অনেক শব্দ ও আচার-আচরণ খুঁজে পাওয়া যায়, যা জনজীবনের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে তাকে আর আলাদা করার কোনো উপায় নেই। এমনকি 'হিন্দু' নামটিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমানেরই দেয়া বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। শুধু শব্দই নয়, বাঙালির সমাজজীবনের বহু উপকরণ ও অনুষঙ্গও এসেছে বহিরাগত মুসলমানদের কাছ থেকে। যেমন— পোশাক, বাংলা সন, বিচারব্যবস্থা, হাট-বাজারের ধারণা, মাপনপদ্ধতি, বিলাসদ্রব্যের ব্যবহার, বাগান-চর্চা ইত্যাদি। তিনি আরো দেখিয়েছেন— বহু সংস্কৃত ও আরবি-ফারসিজাত শব্দ হাত ধরাধরি করে, গলাগলি করে রয়েছে; আর এভাবেই বাঙালিজীবনে মুসলমানরা তাদের স্থায়ী প্রভাব তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। (সূত্র : *বাঙালি জীবনে মুসলমান প্রভাব*, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।)

অন্যদিকে রমেশ চন্দ্র মজুমদার হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলনে একটি সমন্বিত সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে— এই ধারণার বিরোধিতা করে বলেছেন, গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত 'মুসলমান সংস্কৃতি' তার স্বরূপ পরিবর্তন করেনি এবং এই সংস্কৃতির ভিত্তি হচ্ছে ইসলাম ধর্ম। হিন্দু বা ভারতীয় সংস্কৃতির কিছুটা প্রভাব পড়লেও এই সংস্কৃতি বরাবরই তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এসেছে এবং অতি সহজেই তা চিহ্নিত করা যায়। (সূত্র : *মুসলমান সংস্কৃতি*, শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার।)

আবদুল মওদুদও মনে করেন— হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতি পৃথক সত্ত্বা নিয়ে অবস্থান করেছে। তাদের মধ্যে সংঘাত ও আদান-প্রদান হলেও 'কখনও দুটিতে সঙ্গম ঘটেনি, সমন্বয় হয়নি।' বরং 'সমান্তরাল রেখার মতো' তারা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেই পাশাপাশি চলেছে।

বদরুদ্দীন উমর 'মুসলিম সংস্কৃতি'কে ব্যাখ্যা করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। তিনি মনে করেন— ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে একটি জাতির বিভিন্ন অংশের সংস্কৃতিতে যেটুকু পার্থক্য ঘটে তারচেয়ে বেশি ঘটে আর্থিক কারণে। অর্থাৎ একই ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীতে অবস্থানের কারণে দুজন মানুষের সংস্কৃতিতে ব্যাপক পার্থক্য তৈরি হয়। ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে, মুসলিম সংস্কৃতি বলতে যা বোঝানো হয় তার পরিচয় নিহিত আছে সামন্ত্রতান্ত্রিক মূল্যবোধের মধ্যে— ইসলামের মধ্যে নয়। (সূত্রঃ *মুসলিম সংস্কৃতি*, বদরুদ্দীন উমর।)

বিপরীত মত পোষণ করেছেন এস ওয়াজেদ আলী তাঁর 'মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ' প্রবন্ধে। হজরত মুহাম্মদ (স.) এর ঔদার্য ও মহানুভবতার নানাবিধ উদাহরণ দিয়ে তিনি আচার-সর্বস্ব ধর্ম-কর্মের পরিবর্তে ইসলামের দার্শনিক দিকগুলোর প্রতি অধিকতর গুরুত্বারোপ করেছেন— এবং বলেছেন, শান্তি, সাম্য ও মানবকল্যাণের পক্ষে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবিরাম কাজ করে যাওয়াটাই মুসলিম সংস্কৃতির মূল উদ্দেশ্য।

'ইতিহাসের আলোকে বাঙলাদেশের সংস্কৃতি : ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগ' শিরোনামের লেখাটিতে তাজুল ইসলাম হাশমী হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মনে করেন— ব্রিটিশ সরকার তাদের নিজেদের স্বার্থেই এই অঞ্চলে একটি প্রভুভক্ত সামন্তশ্রেণীর জন্ম দেয়। এই শ্রেণী আবার জন্ম দেয় এমন এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতির যা মূলত অদৃষ্টবাদী, ধর্মকেন্দ্রিক, শ্রেণীপার্থক্য ও বৈষম্যে বিশ্বাসী। আর এই সামন্ত-সংস্কৃতিই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অমোচনীয় সাংস্কৃতিক বৈষম্য ও দূরত্ব তৈরি করে। তাঁর মতে— বৃটিশপূর্বকালে সমগ্র বাংলায় কখনোই একক সংস্কৃতির অধিকারী কোনো সুসংবদ্ধ জনগোষ্ঠী না থাকলেও সংস্কৃতিক ভিন্নতা নির্ধারিত হতো শ্রেণীচরিত্রের দ্বারা— ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা নয়। ১৮ ও ১৯ শতকে বাংলায় যেসব সংস্কার আন্দোলন হয়েছে, তিনি সেগুলোকে প্রগতিশীল কর্মকাণ্ড বলে মনেই করেননি! বরং হিন্দু জমিদারদের সমর্থনপুষ্ট, হিন্দু-এলিটদের এইসব আন্দোলনের কোনো ইতিবাচক প্রভাব বাংলার সাধারণ মানুষের ওপর আদৌ পড়েনি বলেই তাঁর মত। অন্যদিকে মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনগুলোকে তিনি দেখেছেন জমিদার বিরোধী কৃষক-শ্রমিকের শ্রেণীসংগ্রাম হিসেবে। পরস্পরবিরোধী এই দুই ধরনের আন্দোলন হিন্দু-মুসলমানকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় বলে তিনি মনে করেন, ফলে সাম্প্রদায়িকতাই হয়ে ওঠে সমাজের মূল চালিকাশক্তি।

গোপাল হালদারের বিশ্লেষণ অন্যরকম। তিনি মনে করেন— এদেশে ইসলাম আসার পর বিজেতার ধর্মের স্বাভাবিক মর্যাদায় আকৃষ্ট হয়ে, অন্যদিকে হিন্দুধর্মের বৈষম্য ও অধিকারভেদ এবং উৎপীড়নের বিপরীতে ইসলামের সাম্যের বাণীতে মুগ্ধ হয়ে জনগণ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু এই জনগণ ছিলো দরিদ্র ও পীড়িত, ধর্ম পরিবর্তনও তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারেনি। মুসলমানদের মধ্যে তাই অভিজাত শাসকশ্রেণী এবং নিম্নবিত্তের আধিক্য থাকলেও মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে ওঠেনি। মধ্যযুগের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় হিন্দু-মুসলমান সমানভাবে অংশগ্রহণ করে বাঙালি সংস্কৃতির নবজন্ম সম্ভবপর করে তোলে। মুসলমানদের মধ্যে সুফীবাদ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে এই সময়েই, যা ছিলো আচারসর্বস্ব ধর্মের বিরুদ্ধে একটি বৈপ্লবিক প্রতিবাদের প্রকাশ। কিন্তু উনিশ শতকে বৃটিশ-বিরোধিতার নামে ওহাবি মতবাদ ও আন্দোলনের ফলে মুসলমানরা গোঁড়ামিতে আক্রান্ত হয়। নিজ ধর্ম ছাড়া সবই বর্জনীয়— এই একরোখা অবস্থানের কারণে তারা সেই যৌথসংস্কৃতি থেকে নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে জাতীয়তাবাদের উন্মেষকালে হিন্দু চিন্তাবিদেরা মুসলমানদেরকে এদেশের মানুষ হিসেবেই বিবেচনা করেননি। আর এটাকেই হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছিন্নতার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। (সূত্র : *মুসলমান বাঙালীর কালচার*, গোপাল হালদার)।

অন্যদিকে এ কে নাজমুল করিম তাঁর 'বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতি' রচনায় বাঙালি সংস্কৃতি মানে হিন্দু সংস্কৃতি বা বাঙালি মুসলমান হিন্দুদের মতো মনেপ্রাণে বাঙালি নয়— এই ধরনের বহুল প্রচারিত ধারণাগুলো খণ্ডন করে দেখিয়েছেন— বাঙালি মুসলমানই বাঙালি সংস্কৃতির মূল ধারক ও বাহক। তিনি বাঙালি হিন্দুর সংস্কৃতিকে উত্তর ভারতীয় আর্য-সংস্কৃতির একটি 'উপশাখা' হিসেবে বর্ণনা করে, মুসলমানদের সংস্কৃতিকে এই মাটির সংস্কৃতি বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন— এই সংস্কৃতির ওপর ইসলামের প্রভাব আছে বটে, তবে সেই ইসলাম বাঙলার পলিমাটিতে নতুন রূপ পেয়েছে, পরিণত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে প্রেম ধর্মে। বাঙালি মুসলমানের গড়ে তোলা হাজার বছরের লোকসাহিত্যে এর প্রমাণ মেলে। এই সংস্কৃতিকে 'জন সংস্কৃতি' নাম দিয়ে তিনি বলেছেন— 'এর দৃষ্টি ও লীলাক্ষেত্র মূলত বাংলাদেশ।'

৬

বাঙালির সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা এবার এর দু-একটি অনুষঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারি। যেমন, প্রশ্ন করা যায় খাদ্যাভ্যাস নিয়ে। বাঙালির প্রধান খাদ্য ভাত-মাছ কেন? (সবাই ভাত-মাছ পাচ্ছে কী না সেটা ভিন্ন প্রশ্ন, পাক আর না পাক তাদের প্রধান এবং প্রিয় খাদ্য যে ভাত-মাছ সেটা তো আর অস্বীকার করা যাবে না!) কেন ভাত-মাংস নয়? অথবা রুটি-মাংস নয়? এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া কঠিন নয়। কৃষিপ্রধান একটি দেশে— ধান যেখানে প্রধান শস্য— সেখানে ভাত যে প্রধান খাদ্য হবে তা আর অস্বাভাবিক কী? আর যে দেশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আছে নদী-নালা-খাল-বিল-হাওড়-পুকুর-দীঘি এবং যেখানে প্রাকৃতিকভাবেই প্রচুর মাছের জন্ম হয়— সেখানে মাছও যে প্রধান খাদ্যতালিকায় স্থান করে নেবে সে-ও তো বিস্ময়কর নয়। তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, একটি জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সেই দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলী অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। এ দেশের ভূ-প্রকৃতি যদি পানি প্রধান না হতো, তাহলে মাছ নিশ্চয়ই প্রধান খাবার হতো না! কোনো মরুপ্রধান অঞ্চলে মাছ প্রধান খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয় বলে শোনা যায় না। এরকম প্রশ্ন তোলা যায় পোশাক-আশাক নিয়েও। বাংলাদেশের মানুষ রুশদের মতো ফারকোট পরে না কেন, কিংবা আরবদের মতো আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে ঢেকে চলাফেরা করে না কেন? কারণ— বাংলাদেশের জলবায়ু বা আবহাওয়া ওই ধরনের পোশাককে অনুমোদন করে না, কিংবা এই আবহাওয়ায় ওই ধরনের পোশাক পরার দরকার নেই। রুশরা প্রবল শীত থেকে বাঁচার জন্যই ওরকম পোশাক পরে, অন্যদিকে মরুভূমির লু-হাওয়া এবং প্রচণ্ড গরম আবহাওয়া থেকে বাঁচার জন্য আরবদের তাপ প্রতিরোধক সাদা পোশাক পরতে হয়। শুধু জলবায়ু বা আবহাওয়াই নয়, প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্য-বৈশিষ্ট্যও মানুষের স্বভাব-চরিত্র এবং তার সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। মরুভূমির রুক্ষতাও সুন্দর, যেমন সুন্দর আগ্নেয়গীরির অগ্ন্যুৎপাত, কিন্তু দুটোই আগ্রাসী সুন্দর বা অ্যাগ্রেসিভ বিউটি। যেসব দেশে এগুলো আছে সেখানকার মানুষ যে একটু রুক্ষ হবে, কিংবা তারা যে আগ্রেসিভ বিউটি পছন্দ করবে তা আর অস্বাভাবিক কী? অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কোমল ও মায়াময়, এ দেশের মাটি নরম ও উর্বর। এই রুক্ষ ঢাকা শহরেও প্রায় অবহেলায় যে পরিমাণ গাছ জন্মায় তা পৃথিবীর আর ক-টি শহরে জন্মায় সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এ দেশের যে দিকেই তাকাবেন, দেখবেন সবুজ, দেখবেন শান্ত-রূপময়ী নদী। এমন কোমল, মায়াময় প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠা মানুষগুলো যে একটু আবেগপ্রবণ হবে সে তো বলাই বাহুল্য, পছন্দের বেলায় অ্যাগ্রেসিভ বিউটির চেয়ে তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে সফট বিউটিকেই বেশি গুরুত্ব দেবে সেটাই তো স্বাভাবিক। নদীমাতৃক এই দেশের নদীনালা-হাওর-বিল যে শুধু মানুষের খাদ্যাভ্যাস তৈরিতেই ভূমিকা রেখেছে তা নয়, মানুষের স্বভাব-চরিত্র নির্মাণেও ভূমিকা রেখেছে। নদীতীরবর্তী বা পানিপ্রধান অঞ্চলের মানুষ সাধারণত অবৈষয়িক, উদাসীন এবং ভাববাদী ধরনের হয়। এদেশের বাউল সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও বিকাশের দিকে নজর দিলেও বিষয়টির সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে। আমাদের বাউলরা প্রায় সকলেই পানিপ্রধান অঞ্চলের মানুষ। সম্ভবত নদীর মধ্যে ঘর-ছাড়ার একটা ইঙ্গিত আছে, আছে ভাববাদিতা।

সংস্কৃতি সম্বন্ধে এভাবে অনেক কথাই বলা যায়, বাঙালি সংস্কৃতির ওপর আমাদের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রভাব নিয়েই রচিত হতে পারে আলাদা একটি প্রবন্ধ, যেমন হতে পারে খাদ্যাভাস, উৎপাদন পদ্ধতি, উৎসব-পার্বণ, পোশাক-আশাক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি নিয়েও।

৭

বিনয়কুমার সরকারের যে লেখাটির ('বেঙ্গলি কালচার অ্যাজ এ সিস্টেম অব মিউচ্যুয়াল আককুলটুরেশনস') কথা একটু আগে বলেছি, সেটিতে তিনি এক গভীর ও সুদুরপ্রসারী প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। ১৯৪২ সালে এই লেখাটির বাংলা অনুবাদ করেন ক্ষিতি মুখোপাধ্যায়। শুধু অনুবাদই নয়, রচনাটির অনুপঙ্খ বিশ্লেষণও হাজির করেন তিনি। এই লেখা ও এর বিশ্লেষণের মূল কথটি হলো সংস্কৃতির বিনিময়। আককুলটুরেশনস কথাটির ব্যাখ্যা এরকম—

> কোনো সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতির ভিতর প্রবেশ করিতে থাকিলে দ্বিতীয় সংস্কৃতিটার অল্পবিস্তর অথবা বেশকিছু রদবদল ঘটিতে থাকে। এই দুই সংস্কৃতি হইতে সংস্কৃতির নতুন গড়ন বা ছাঁচ গড়িয়া ওঠে।...দুই সংস্কৃতির মেলামেশার প্রণালীকেই আককুলটুরেশনস বলা যায়।...আর মিউচ্যুয়াল আককুলটুরেশনস মানে পারস্পরিক সংস্কৃতি-বিনিময়, বা সংস্কৃতির লেনদেন। [সূত্র : *বাঙলায় দেশী-বিদেশী (বঙ্গ-সংস্কৃতির লেন-দেন)*, বিনয় সরকার, ১৯৪২]

তাঁরা দেখালেন, আদি বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য সংস্কৃতির বিনিময়ের ফলে নতুন সংস্কৃতির ধরন কীভাবে পাল্টে গেলো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দিকটার প্রতি তাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, সেটি হলো— বাংলায় বিভিন্ন ধর্মের প্রবেশ এবং এর প্রভাবে বাঙালি সংস্কৃতির রূপান্তর, একইভাবে বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবে বাইরে থেকে আসা ধর্মগুলোর রূপান্তর। তাঁদের মতে– শুধু ইসলামই নয়, হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মও বাংলা অঞ্চলের বিদেশী ধর্ম। এইসব ধর্মের আগমনের আগেও এ অঞ্চলের মানুষের নিজস্ব কোনো ধর্ম ছিলো— তাঁরা এর নাম দিয়েছেন 'বাঙালী ধর্ম'। তাঁরা এ-ও বললেন— ইসলাম আসার আগে এ অঞ্চলের সমস্ত মানুষ হিন্দু বা বৌদ্ধ ছিলো— ঐতিহাসিক এই ধারণাটিই ভুল। বরং এক বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠী অ-হিন্দু বা অ-বৌদ্ধ রয়ে গিয়েছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা কেউ কেউ সে-সব ধর্ম গ্রহণ করলেও তা এমনভাবে তাঁদের আদি সংস্কৃতির ছাঁচে ঢেলে পরিবর্তিত করে নিয়েছিল যে তাদেরকে বড়জোর নিম-হিন্দু বা নিম-বৌদ্ধ বলা যায়। ইসলাম আগমনের ফলে এই অঞ্চলের অ-হিন্দু বা অ-বৌদ্ধ এক বিরাট সংখ্যক লোক, সঙ্গে কিছু হিন্দু এবং কিছু বৌদ্ধও নতুন ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু নিজস্ব সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেয়া এ ক্ষেত্রেও ঘটেনি। ফলে প্রত্যেক ধর্মই বাঙালি ধর্মের দাপটে নিজেদের আদি রূপ খুইয়ে নতুন এক রূপ লাভ করে। এ বিষয়ে তাঁদের মত—

> বাঙালী হিন্দুরা পরধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত কনভার্ট মাত্র। ইংরেজ খৃষ্টিয়ানরা, মিশরের মুসলমানরা, ইরানের মুসলমানরা যেমন পরধর্মে দীক্ষিত, বাঙালীরাও অবিকল তাই।...হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্ম সেকালের বাঙলার 'অনার্য' নর-নারীর পক্ষে বিদেশী জিনিস। কিন্তু বাঙালী জাত এই বিদেশী ধর্ম ও সংস্কৃতিকে নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির বশে আনিয়াছিল। তথাকথিত আর্যধর্ম ও সংস্কৃতি অনার্য সংস্কৃতির প্রভাবে পড়িয়া অনার্যীকৃত হইয়াছে। ইহাকে বলিব অবাঙালী সংস্কৃতির বাঙালীকরণ। হিন্দুধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম অনায়াসে বাঙালীদের জয় করিয়া লইতে পারে নাই। বাঙালী ধর্মের নিকটও ইহাদের মাথা নোয়াইতে হইয়াছে।...আর্যধর্ম যেমন বাঙলাদেশকে জয় করিয়াছে, বাঙালী ধর্ম-ও তেমনি ইহাকে নাজেহাল করিয়াছে। জয়টা এক তরফা হয় নাই— ধর্মান্তর বা মতান্তর গ্রহণটা হইয়াছে পারস্পরিক। বাঙলাদেশে খুব বেশী লোককে পরধর্ম (হিন্দুত্ব) স্বীকার করানো সম্ভব হয় নাই। অসংখ্য নরনারী অহিন্দু, অর্থাৎ বাঙালী বা অনার্য রহিয়া গিয়াছিল।...বাঙালীর সৃষ্টিশক্তি ইসলামকেও সহজে পথ ছাড়িয়া দেয় নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মতো ইসলামকেও বাঙালীদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতিকেও বুঝিয়া রাখিতে হইবে।...বিদেশী সংস্কৃতিগুলোর উপর স্বদেশী সংস্কৃতির প্রভাব গভীরভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। [সূত্র : *বাঙলায় দেশী-বিদেশী (বঙ্গ-সংস্কৃতির লেন-দেন)*, বিনয় সরকার, ১৯৪২]

এর ফল কী রকম সুদূর প্রসারী হয়েছিল তার প্রমাণ হিসেবে বলছেন—

> বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানদের আচার-ব্যবহার ও চালচলনে মিল আছে। কারণ কী? সাধারণের ধারণা— হিন্দুদের কেহ কেহ মুসলমান হইয়া যাওয়ায় এইরূপ ঘটিয়াছে। কথাটার ভিতর কিছু সত্য আছে। কিন্তু আসল কারণ— হিন্দু ধর্মের মতো মুসলমান ধর্মেও অনার্য বাঙালী আদিম লোকদের আচার-ব্যবহার আর চালচলন ঢুকিয়া গিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মেই 'বাঙলামি'র প্রলেপ পড়িয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের উপর খাঁটি স্বদেশী সংস্কৃতি দিগবিজয় চালাইতেছে। এই কথাটা মনে রাখিলে বাঙালী হিন্দু এবং মুসলমানদের রীতিনীতির ভিতর ঐক্য ও সাদৃশ্যগুলো সহজে বুঝিতে পারিব। দুই সংস্কৃতিই 'বাঙালীকরণের' প্রভাবে অনেকটা একরূপ দেখাইয়া থাকে। [সূত্র : *বাঙলায় দেশী-বিদেশী (বঙ্গ-সংস্কৃতির লেন-দেন)*, বিনয় সরকার, ১৯৪২]

অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মের আগমনে আদি বাঙালি সংস্কৃতি তার রূপ পরিবর্তন করেছে বটে, কিন্তু এই সংস্কৃতি এতটাই শক্তিশালী এবং আধিপত্যবিস্তারী ছিলো যে প্রবল পরাক্রমশালী হিন্দুধর্ম বা ইসলাম ধর্মও তাদের নিজেদের 'আদি' রূপ ধরে রাখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারেনি, বরং আদি বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবে দুটো বিপরীত মেরুর ধর্ম কখনো কখনো একইরূপ প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়েছে, এখনো হচ্ছে। লেনদেন হয়েছে বটে, তবে বাঙালি সংস্কৃতি পরাজয় স্বীকার করেনি।

এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি' গ্রন্থভুক্ত 'বাঙালীর সমন্বিত লোকসংস্কৃতি' রচনায়। তিনি অবশ্য বিনয় সরকারের মতো আর্যপূর্ব বাঙলার ইতিহাস খুঁজে দেখেননি, চর্যাপদের সময়কাল থেকে (অষ্টম-নবম খৃষ্টাব্দ) বর্তমানকাল পর্যন্ত ইতিহাসকে নির্ভর করে বাংলার লোকজীবনে প্রবহমান সংস্কৃতির সমন্বিত রূপটির ধরন-ধারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে— বাংলার জনগণ কৃষিজীবী বলে গ্রামকে কেন্দ্র করেই তাদের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে, আর প্রাচীনকালে একেকটি গ্রামে নানা পেশার লোকজন একসঙ্গে বাস করতো বলে গ্রামগুলো ছিলো প্রায় স্বনির্ভর। রাজরাজড়াদের উত্থান-পতন বা রাজ্যের সীমা পরিবর্তন তাদের জীবনে কোনো প্রভাবই ফেলেনি। তাদের মধ্যে একটা সাধারণ সমঝোতা ছিলো, যেমন— ধর্মবিশ্বাসকে তারা তাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল কিংবা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে সম্মিলিতভাবেই রুখে দাঁড়াতো। আর্যরা এদেশে আসার আগেই জনগণের যে স্বাধীন সাংস্কৃতিক জীবন ছিলো তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্যরা বঙ্গভূমি বা এর অধিবাসীদের সুনজরে দেখতো না, কারণ, সম্ভবত এদের জীবনযাপনের অনুষঙ্গসমূহ আর্যদের থেকে পৃথক ছিলো। তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, আর্যরা শ্রেষ্ঠ ছিলো, কারণ— ভিন্নতা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে না। লিখিত বাংলাভাষার জন্মকালকে লোকসংস্কৃতির শৈশবকাল বলা যায়। আর এর প্রথম লিখিত নিদর্শন চর্যাগীতি 'আধ্যাত্মিক প্রেরণাজাত' হলেও 'ইহজাগতিক প্রতীকে' রচিত। এতে মনে হয় 'লোকায়ত দার্শনিক চিন্তাপ্রসূত সামাজিক শ্রেণীচেতনা সেকালেও এ অঞ্চলের জনজীবনকে প্রভাবিত করেছে।'

এরপর এ অঞ্চলে ইসলামের প্রবেশ ঘটে। তবে এ ইসলাম হযরত মুহাম্মদ (স.) প্রবর্তিত অবিকৃত ও নির্ভেজাল ইসলাম নয়। প্রবর্তিত হওয়ার প্রায় ৬০০ বছর পর এদেশে আসার সময় ইসলাম ইরান, মধ্যএশিয়া, আফগানিস্তানের বহু লোকাচার সঙ্গে নিয়ে আসে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়— সুফীগিরী, দরবেশী ইত্যাদি আদি ইসলামে নেই। সুফী-দরবেশদের অধিকাংশই ছিলেন মানবতাবাদী ও বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়কারী। আর এঁরা এদেশে এসে ভারতীয় দর্শনের চারটি মূলধারার সঙ্গে পরিচিত হন— ১. স্রষ্টা ও সৃষ্টি পৃথক সত্ত্বা। ২. স্রষ্টা ও সৃষ্টি অভিন্ন সত্ত্বা। ৩. নিরীশ্বরবাদিতা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরবতা। ৪.স্থূল জড়বাদিতা। তাঁরা দ্বিতীয় ধারাটিকে পুষ্ট করে তোলেন। তাঁরা আসার আগে এদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিলো এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বৌদ্ধমত দুর্বল হয়ে পড়লেও জনগণের মধ্যে এর প্রভাব বিদ্যমান ছিলো। মুসলিম সুফি সাধকরা এইসব ধারা সম্বন্ধে জানতেন এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের বর্ণভেদ বুঝতেন না বা মানতেন না; ফলে মানবতাবাদী, প্রেমভক্তিতে পূর্ণ পরিবর্তিত ইসলাম ধর্ম জনগণের মধ্যে আবেদন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃষ্টি করে। তবে জনগণ ধর্মান্তরিত হলেও হাজার বছরের ঐতিহ্য ও অনুষঙ্গসমূহের সঙ্গে নতুন ধর্মের সমন্বয় করে নিয়েছে। সুফীদের আগমনের ফলে প্রেমভক্তিবাদ হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এটা সব ধর্মের এক ধরনের সমন্বয়ও বটে— যা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে অভিন্ন মানবিক সমতলে নিয়ে আসে। সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব এর মূলমন্ত্র।

মুসলিম শাসনামলেই 'বাঙলা' ও 'বাঙালি' শব্দদ্বয়ের উদ্ভব ঘটে। মুসলিম শাসকরা এ অঞ্চলকে একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সর্বজনগ্রাহ্য সমন্বিত সামাজিক জীবনবোধ নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। এই সময়কালকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভবকাল বলা যেতে পারে। এই সময়ে মানবতাবাদী লোকসংস্কৃতির চর্চা, উদার-অসাম্প্রদায়িক প্রেমভক্তিবাদী ধর্মচর্চার ফলে এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠী একটি অবিভাজ্য জাতি হিসেবে গড়ে ওঠে এবং তার লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য পূর্ণতা পেতে থাকে। এই সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য— আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব, অনড় বিধিবিধান সম্বলিত ধর্মের প্রতি উদাসীনতা। এই উদাসীনতাকে এক ধরনের বিদ্রোহও বলা যায়।

বাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে সুফী-দরবেশ, সাধু-সন্ন্যাসী, বাউল-বৈরাগীরা যে সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিলেন তা হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ নির্বিশেষে সকল ধর্ম্-বর্ণের মানুষকে একইরকম জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। আর এজন্যই:

> হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে এখনও বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের গান বাজনা তাল সুর লয় এবং নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্র অভিন্ন। নির্দিষ্ট কয়েকটি ধর্মানুষ্ঠান এবং মৃতের সৎকার প্রভৃতি ব্যতিরেকে বাকি সকল প্রকার আনন্দোৎসব মেলা প্রভৃতিতে সকলে একত্রিত হয়। লাঠি খেলা, তরবারি ও রামদার খেলা, হাডুডু ও দাইড়া খেলা প্রভৃতি সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের ক্রীড়া। বাসগৃহের নির্মাণ কৌশল, ভিতরের আসবাব, নকশি কাঁথা, শয্যা, তৈজসপত্র, কৃষি যন্ত্রপাতি, অস্ত্র-শস্ত্র সবকিছু অভিন্ন। একই মাঠের জমিতে সকলে পাশাপাশি চাষ করে এবং একই ফসল ফলায়। উৎপাদন পদ্ধতিও অভিন্ন। ধর্মীয় বিধানে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ কয়েকটি দ্রব্য ব্যতিরেকে ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল বাঙালীর খাদ্য তালিকা ও পাক প্রণালী অভিন্ন।...সকল বাঙালী পল্লীবাসীর পোশাক পরিচ্ছদ অলংকারপত্র প্রসাধন দ্রব্য প্রভৃতি আগেও অভিন্ন ছিলো, কিঞ্চিৎ উন্নতির পর এখনও অভিন্ন আছে। [সূত্র : *লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি*, আবু জাফর শামসুদ্দীন।]

আর্যরা এ দেশে আসার আগেই যে এখানকার জনগণের স্বাধীন সাংস্কৃতিক জীবন ছিলো তার অনেক প্রমাণের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন— বাংলার গ্রামগুলো ছিলো স্বয়ংসম্পূর্ণ, বিভিন্ন পেশার লোকজন এক গ্রামে একসঙ্গে বাস করতো, রাজ-রাজড়াদের উত্থান-পতন তাঁদের এই স্বাধীন জীবনে খুব কমই প্রভাব ফেলতো। কিন্তু আর্যদের আগমন, পরবর্তীকালে বৌদ্ধ-হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের আগমন তাদের সাংস্কৃতিক জীবনে প্রভাব ফেলে। তবে এই প্রভাব যতো না রাজনৈতিক কারণে তারচেয়ে বেশি দার্শনিক কারণে পড়েছে। যখনই যে ধর্ম এখানে এসেছে, তখনই এখানকার জনগণ তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেদের সুবিধামতো একে 'সংশোধন' করে গ্রহণ করেছে। তিনি মনে করেন 'ফান্ডামেন্টাল' বলে জগতে কোনো জিনিসই নেই, এমনকি ইসলাম নিজেও তার জন্ম থেকেই 'ফান্ডামেন্টাল' নয়, বরং এতে তার পূর্ববর্তীকালের অনেক ধর্ম ও সামাজিক আচার ব্যবহারের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। তিনি অনেকগুলো উদাহরণ দিয়ে সেটি প্রমাণও করেছেন। আর ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন সম্বন্ধে তাঁর মত—

> ভারতে যে ইসলাম রাজকীয় ধর্মরূপে পাকাপাকিভাবে প্রবেশ করে সেটা হযরত মোহাম্মদ (দঃ) প্রবর্তিত আরবমরুর 'নির্ভেজাল' ইসলাম ছিলো না। এ ইসলাম ইরান, মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ পার হওয়ার কালে সে সব দেশের বহু লোকাচার সহ, প্রবর্তিত হওয়ার ৬০০ বছর পর, তুর্ক আফগান বিজয়ীদের সঙ্গে আসে। [সূত্র : *লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি*, আবু জাফর শামসুদ্দীন।]

বলা প্রয়োজন— বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে ইসলাম গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে মূলত সুফি-সাধক ধর্মপ্রচারকদের কারণে, শাসক শ্রেণীর জন্য নয়। এ সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত আলোচনা আছে আমার 'সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা ও মনোজগৎ' রচনায়। নিজের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিতে বিব্রত বোধ করছি, তবু প্রাসঙ্গিক বলে কয়েকটি লাইন তুলে ধরছি:

> এ অঞ্চলে বিপুলসংখ্যক মানুষ যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তার অনেকগুলো কারণের মধ্যে অন্তত তিনটি কারণকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়— ১. ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বর্ণভিত্তিক বিভেদনীতি, অত্যাচার-নিপীড়ন, চাপে ও তাপে সাধারণ জনগণ অতিষ্ঠ ছিলো, ২. ঠিক সেই রকম একটি ক্রান্তিকালে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ও শান্তির বাণী নিয়ে ইসলাম ধর্ম এদেশে প্রবেশ করেছিল, এবং ৩. এ বাণী যারা বহন করে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন সুফি সাধক— অনাড়ম্বর জীবনযাপন, মানুষের মন বুঝে কাজ করা ও কথা বলার ক্ষমতা, জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও নিরহংকারী সন্তের মতো সাধারণ মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা-সংকট-সমস্যার সঙ্গী হতে পারার সহজাত প্রবণতা যাঁদেরকে এ অঞ্চলের মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। ... সুফিরা যে ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন তা আরবে উদ্ভাবিত মূল ইসলাম নয়, বরং দার্শনিকভাবে অনেকখানি পরিবর্তিত ও আচারসর্বস্বতা-বর্জিত ইসলাম।... মানুষের কাছে তারা (সুফিরা) বলতে লাগলেন প্রেমের কথা, বোঝাতে লাগলেন স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক দ্বন্দ্বের নয়, প্রেমের। একমাত্র প্রেমের মাধ্যমেই পাওয়া যাবে স্রষ্টাকে— অন্য কোনোভাবে নয়। প্রেম ও ভক্তির এই কথাগুলো এ অঞ্চলের মানুষের কাছে আগে থেকেই পরিচিত ছিলো— তার সঙ্গে যুক্ত হলো মানুষে-মানুষে সমতার কথা, ভ্রাতৃত্বের কথা, সমান অধিকারের কথা, শান্তি ও সম্প্রীতির কথা। তরবারী দিয়ে নয়, কঠোর ধর্মীয় আচারসর্বস্বতা দিয়ে নয়, ভয়-ভীতি-হুংকার দিয়েও নয়— স্রেফ শান্তি-সম্প্রীতি-মানবতা-সাম্য-প্রেম-ভক্তি-ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদির কথা বলে সুফিরা জয় করে ফেললেন একটি বিশাল জনগোষ্ঠীকে। এ অঞ্চলে ইসলামের জয়ের ইতিহাস বলতে বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের কাহিনী বোঝায় না, বোঝায় এই দার্শনিক বিজয়ের ইতিহাস।...(এবং বোঝা যায়) এ দেশের মানুষের মনোজগতে আছে শান্তি-সম্প্রীতি-ভ্রাতৃত্ব-মানবতা ও সাম্যের প্রতি প্রেম। কোনো মৌলবাদী কঠোর কঠিন তত্ত্ব দিয়ে তাদেরকে জয় করা যায়নি— ভবিষ্যতেও যাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবু জাফর শামসুদ্দীনের ভাষায়—

ফান্ডামেন্টাল বলে কোনো বস্তু মানবজাতির সামাজিক জীবনে কোন কালে ছিলো না, সুতরাং তার পুনঃপ্রবর্তন প্রচেষ্টাও সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার নয়। [সূত্র : *লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি*, আবু জাফর শামসুদ্দীন।]

কিন্তু চেষ্টাটি বহুকাল থেকেই চলছে, পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত একদল ধর্মান্ধ লোক ও কয়েকটি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল এ দেশকে একটি ধর্ম-রাষ্ট্রে পরিণত করার দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলগুলোও তাদেরকে আশ্রয়-প্রশ্রয়-সমর্থন দিয়ে চলেছে। এমনকি প্রগতিশীলতার মুখোশ পড়ে কিছু ছদ্মবেশী বুদ্ধিজীবীও তাদের এই প্রচেষ্টার সঙ্গে সামিল হয়েছেন। তাদের এই চেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলেই ধরে নেয়া যায়। কিন্তু বাঙালি সংস্কৃতির যে হাজার বছরের ইতিহাস তাতে নিশ্চিত করেই বলা যায়, একে পরাজিত করা যাবে না। বাঙালি তাদের সংস্কৃতিকে চিরকাল অপরাজেয় রূপে দেখতে চেয়েছে, আর চেয়েছে বলেই পরাজিত হতে দেয়নি। এই এতকাল পর এসে তাদেরকে পরাজিত করা যাবে, এটা মূর্খ ছাড়া আর কে-ই বা ভাবতে পারবে!

[রচনাকাল : জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি, ২০০৮]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসের বিকৃতি, ইতিহাসের কারচুপি

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক চলছে দীর্ঘদিন ধরে— একথা সবাই জানেন। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে— বিতর্কটা আসলে মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে নয়, ঘোষণা নিয়ে। স্বাধীনতার ঘোষণা কে দিয়েছিলেন, এই নিয়ে বাংলাদেশের বড় দুটো রাজনৈতিক দল আর তাদের অনুগত বুদ্ধিজীবীরা দীর্ঘদিন ধরে বাদানুবাদ চালিয়ে আসছেন। কোনো দেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেবলমাত্র স্বাধীনতার ঘোষণা-বিতর্কের পর্যায়ে নামিয়ে আনার মতো এমন বিরল প্রতিভা সম্ভবত শুধু বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলেরই রয়েছে, পৃথিবীর আর কোনো দেশে এমনটি ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। যেন বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ কিংবা জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চের ঘোষণাই এ দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে! স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এসব দলের বারবার ক্ষমতায় আরোহণ এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় যুদ্ধাপরাধীদের অংশগ্রহণের ফলে রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যম ও স্কুল-কলেজ পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে তাদের ইচ্ছেমতো ইতিহাস রচনার প্রবণতা দেখা গেছে। এ এমন এক ইতিহাস যেখানে সারাদেশের কোটি-কোটি মানুষের আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করা হয় না। যে বিপুল দুর্ভোগের ভিতর দিয়ে দেশের মানুষকে যেতে হয়েছে, যে অপরিসীম নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে, যে অকল্পনীয় আত্মত্যাগের ফলে এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, সেগুলোও বলা হয় না। বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা, পাকিস্তানিদের নির্মম নিপীড়ন, হত্যাযজ্ঞ, লুটপাট, রাজাকারদের কুকীর্তি ইত্যাদি নিয়েই বা কতোটুকু আলোচনা হয়? অগুনিত মানুষের জীবনদান, লাখ-লাখ নারীর সম্ভ্রমহানি, অসংখ্য যুদ্ধশিশুর জন্ম, কোটি মানুষের দুঃসহ শরণার্থী জীবন— এই সবকিছুর বিবরণ যদি থাকতো ইতিহাসে, তাহলে কোনোভাবেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে ওই ধরনের তুচ্ছ বিতর্কে নামিয়ে আনা যেত না। স্বাধীনতা অর্জনের সমস্ত কৃতিত্ব রাজনৈতিক দলগুলো নিজেরা নিতে চায়, এমনকি অন্য কোনো দলের নেতাকর্মী হলে তার অবদানটুকুও স্বীকার করতে চায় না, আর সেজন্যেই যুদ্ধে জয় লাভের মূল নায়ক যারা সেই নাম-না-জানা জনগণও উপেক্ষিত থাকে। ঘোষণা-বিতর্কের নামে ইতিহাস বিকৃতির আরেক নাম তাই ইতিহাসের কারচুপি! পরিকল্পিতভাবে এবং সুকৌশলে জনগণের অংশগ্রহণ ও ত্যাগ-তিতিক্ষা, তাদের বিপুল দুর্ভোগ ও দুর্যোগ মোকাবেলা করা, ঘরে ঘরে আক্ষরিক অর্থেই প্রতিরোধ গড়ে তোলা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরস্ত্র জনগণের সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়ক শক্তিতে পরিণত হওয়া— এসব বিষয়কে কম গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করে গুটিকয় নেতার গুণগান গেয়েই ইতিহাস রচনা সমাপ্ত হয়! এবং এজন্যই তরুণ প্রজন্মের মনে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি বিমূর্ত ধারণার জন্ম হয়েছে। শুধু জনগণের অংশগ্রহণের ব্যাপারটিই নয়, এমনকি যুদ্ধকালীন নেতৃত্ব সম্বন্ধেও খুব বেশি আলোচনা চোখে পড়ে না এসব দলীয় ইতিহাস-চর্চায়। '১৭ এপ্রিল, ১৯৭১-এ মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে'— এই তথ্যটুকু ছাড়া অন্য কোনোকিছুই তরুণ প্রজন্মের পক্ষে জানার উপায় থাকে না এসব ইতিহাস পড়ে। এই সরকারটি কীভাবে কাজ করেছে, কী কাজ করেছে, কীভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে— সে সম্বন্ধেও খুব বেশি কিছু জানতে চাই না আমরা। ২৫ মার্চের ক্র্যাক-ডাউনের পর বঙ্গবন্ধুর স্বেচ্ছা-গ্রেফতার বরণ জাতিকে যে নেতৃত্বশূন্য অবস্থায় ঠেলে দিয়েছিল, সেখান থেকে কিভাবে উত্তরণ ঘটলো, কার বা কাদের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হলো, সে-সব বিষয়ে খুব সামান্যই ধারণা আছে আমাদের নতুন প্রজন্মের। আর এই সুযোগটি নিয়েই একটি গোষ্ঠী জিয়াউর রহমানকে জাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালিয়ে এসেছে। তাঁর বেতার ঘোষণাটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও এবং তাঁর দেশপ্রেম, আন্তরিকতা ও বীরত্ব ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন না থাকলেও (বিরোধী পক্ষ অবশ্য প্রশ্ন তোলে, কিন্তু সেগুলো ফালতু প্রশ্ন, এসব বালখিল্য কথাবার্তার কোনো গুরুত্ব নেই। যারা জিয়ার আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তারা একবারও ভাবেন না যে, তিনি ছিলেন সামরিক বাহিনীর লোক— ওই ঘোষণা পাঠ করার পর যদি দেশটি স্বাধীন না হতো তাহলে তাঁকে ভয়াবহ শাস্তির মুখোমুখি হতে হতো! এই ঝুঁকি নিয়েও যিনি কাজটি করেছিলেন, তাঁর আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অযৌক্তিক), যুদ্ধের সময় তিনি যে একজন সেক্টর কমান্ডারের অধিক কিছু ছিলেন না এবং একজন সেক্টর কমান্ডারের পক্ষে যে এত বড়ো একটি যুদ্ধ পরিচালনা করা সঙ্গত কারণেই সম্ভব ছিলো না, এটা সামান্যতম কমনসেন্স থাকলেও যে-কেউ বুঝতে পারবেন। কিন্তু এসব নিয়ে ভাবাভাবির সময় কোথায়? ঘোষণাই তো শেষ কথা, কীভাবে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে, সারাদেশের সমস্ত মানুষ কী অপরিসীম বেদনা ও ভোগান্তির ভিতর দিয়ে সময় পার করেছে, কী বিপুল পরিমাণ আত্মত্যাগের ফলে অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রিয় এই স্বাধীনতা— এসব নিয়েই বা কথা বলার দরকার কী? ঘোষণা বিতর্ক এভাবেই ইতিহাসকে চাপা দিয়ে রেখেছে যুগ যুগ ধরে!

ইতিহাস কারচুপির এই ঘটনাটিকে পাশে সরিয়ে রেখে কীভাবে পরিচালিত হয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, আসুন প্রিয় পাঠক, সে নিয়ে কিছু কথা বলি। এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থের সহায়তা নিতে পারি আমরা— মঈদুল হাসানের 'মূলধারা'৭১'।

২

যে-কোনো যুদ্ধের ইতিহাসই নানারকম জটিল উপাদানের সমন্বয়ে গড়ে ওঠার কথা, ওঠেও। বিশেষ করে এ যুগের যুদ্ধগুলো শুধুমাত্র অঞ্চলভিত্তিক যুদ্ধেই সীমাবদ্ধ থাকে না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার এক বা একাধিক আন্তর্জাতিক প্রভাব ও পরিপ্রেক্ষিতও থাকে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধও তেমনই একটি বিষয়। *মূলধারা '৭১* গ্রন্থে মঈদুল হাসান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এমন একটি অধ্যায়ের— 'মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনা, উদ্যোগ ও মূল ঘটনাধারা'— প্রকৃত স্বরূপ তুলে এনেছেন যেটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আলোচনায় প্রায় উপেক্ষিতই থাকে, আর এজন্য তিনি বেছে নিয়েছেন প্রবাসী সরকারের কর্মকাণ্ড ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটকে। যুদ্ধের সময় লেখক তাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন এবং সংগ্রামের সাংগঠনিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। সঙ্গত কারণেই সেসবের একটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ এ গ্রন্থে রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান যে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাতে পারে, ২৫ মার্চের অনেক আগেই শেখ মুজিব সেটি অনুমান ও আশংকা করেছিলেন। এবং সেরকম কিছু ঘটলে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের কাছ থেকে কি ধরনের সহায়তা পাওয়া যেতে পারে সেটি জানার জন্য তাজউদ্দিন আহমদকে ৫/৬ মার্চ ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার কে সি সেনগুপ্তের সঙ্গে আলোচনা করতে পাঠিয়েছিলেন। সেনগুপ্ত এর উত্তর সন্ধানে দিল্লিতে যান এবং ফিরে এসে তাজউদ্দিনকে 'ভাসাভাসা'ভাবে জানান যে, 'পাকিস্তানী আঘাতের সম্ভাবনা সম্পর্কে ইসলামাদস্থ ভারতীয় হাই কমিশন সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন; তবু "আঘাত যদি নিতান্তই আসে" তবে ভারত আক্রান্ত মানুষের জন্য "সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা" প্রদান করবে।' ২৪ মার্চ সেনগুপ্তের সঙ্গে তাজউদ্দিনের পরবর্তী বৈঠক হবার কথা থাকলেও সেটা হতে পারেনি। ফলে ২৫ মার্চের হামলার পর— ভারতের কাছ থেকে কী ধরনের সহযোগিতা পাওয়া যাবে বা আদৌ পাওয়া যাবে কী না— এই অনিশ্চয়তা মাথায় নিয়েই তাজউদ্দিন তাঁর তরুণ সহকর্মী আমিরুল ইসলামকে নিয়ে সীমান্তে পৌঁছান। কিন্তু অচিরেই তিনি উপলব্ধি করেন যে, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছে বাংলাদেশকে সহায়তা করার জন্য উর্ধ্বতন কতৃপক্ষের কোনো নির্দেশ এসে পৌঁছেনি। ৩ এপ্রিল তিনি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পান এবং তাঁর জিজ্ঞাসার জবাবে জানান যে, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ২৬/২৭ মার্চেই একটি সরকার গঠিত হয়েছে, এবং তিনি সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী। এই সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়ার জন্য তিনি ভারতকে অনুরোধও জানান। কিন্তু তখন পর্যন্ত সরকার গঠন তো দূরের কথা, সহকর্মীরা বেঁচে আছেন কী না সেটাও তাজউদ্দিনের জানা ছিলো না! উল্লেখ্য যে, স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী সরকার গঠিত হয় ১০ এপ্রিল, শপথ গ্রহণ করে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১। যদিও তার আগেই— ১১ এপ্রিল— তাজউদ্দিন আহমদ বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেতার ভাষণ দেন। তিনি যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন তার পেছনে একটি তাৎপর্যময় কারণ ছিলো। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে প্রতিরোধ যুদ্ধে সহায়তা চাওয়া আর বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সহায়তা চাওয়া যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার এবং ভিন্ন মাত্রাযুক্ত সেটা তাজউদ্দিন আহমদ যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন। আগেই উল্লেখ করেছি, সাক্ষাতের শুরুতেই ইন্দিরা গান্ধি জানতে চেয়েছিলেন— 'আওয়ামী লীগ ইতিমধ্যেই কোনো সরকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গঠন করেছে কী না'! এবং ইতিবাচক উত্তর পেয়ে তিনি— 'বাংলাদেশ সরকারের আবেদন অনুসারে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন।' তাজউদ্দিন আহমদের এই দূরদর্শিতা তাঁর 'প্রধানমন্ত্রীত্বের' নয় মাস ধরেই কার্যকর ছিলো। আরেকটি উদাহরণ দিলে সেটি আরো পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে— ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেও এটিকে তিনি স্রেফ 'দাবি' হিসেবেই জিইয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, কোনো চাপ বা তদবির করে একে তরান্বিত করতে চাননি। কারণ, একদিকে বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে ভারতের বাস্তবসম্মত কিছু অসুবিধা ছিলো— সেটি যেমন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, অন্যদিকে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় স্বীকৃতি পেলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যে ক্ষতিগ্রস্থ হতো— সেটিও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। (সেক্ষেত্রে পাকিস্তান একে 'ভারতীয় ষড়যন্ত্র' বলে বিশ্বের কাছে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ যেমন পেতো, তেমনি এই যুদ্ধকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বলে চালিয়ে— ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের মতো— আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার চেষ্টা করতো, যা পরিশেষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অঙ্কুরেই মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতো।) তাজউদ্দিন আহমদ তাঁর রাজনৈতিক ও দার্শনিক প্রজ্ঞার কারণে বিষয়গুলো উপলব্ধি করতে পারলেও আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতাই সেটি পারেননি, ফলে সরকার গঠনের পর থেকেই তাজউদ্দিন আহমদকে নানারকম উপদলীয় ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে হয়। জানা যায়, অন্তত অক্টোবরের আগ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের প্রচারণা ছিলো— 'তাজউদ্দিনের মুক্তিযুদ্ধের নীতি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, ভারতের ভূমিকা অস্পষ্ট বা ক্ষতিকর এবং সোভিয়েত ভূমিকা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী।' অক্টোবরের দিকে এসে তাঁর অনুসৃত নীতির ইতিবাচক ফলাফল দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে পরিষ্কার হয়ে এলে দলের ভিতর থেকে এমন অভিযোগ ওঠে যে, তিনি— 'প্রবাসী সরকারের সর্বস্তরে আওয়ামী লীগের দলগত স্বার্থ নিদারুণভাবে অবহেলা করে চলেছেন এবং বঙ্গবন্ধুর মতাদর্শের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করে আওয়ামী লীগ বিরোধী শক্তিদের জোরদার করছেন।' কেন এমন অভিযোগ উঠেছিল সে প্রসঙ্গে একটু পরে আসবো। তাঁর বিরুদ্ধে একদিকে খন্দকার মোশতাক এবং মাহবুব আলম চাষীর নেতৃত্বে দলের ভিতরকার ডানপন্থী অংশ, অন্যদিকে ফজলুল হক মণির নেতৃত্বে 'মুজিব বাহিনী' সংগঠিত হতে থাকে এবং তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাতে থাকে। শুধু তাই নয়, তারা একত্রিত হয়ে তাজউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে না নেবার ঘোষণা দিয়ে যুক্ত সাক্ষর পাঠিয়ে দেন ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে। একদিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিপীড়ন, বাঙালির মুক্তির লড়াই, আন্ত র্জাতিক ষড়যন্ত্র; অন্যদিকে এইসব উপদলীয় কোন্দল মাথায় নিয়েই তাঁকে নেতৃত্ব দিয়ে যেতে হয়। এমনকি তাঁকে হত্যা করার জন্য মুজিব বাহিনীর ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরেও এবং হত্যার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত যুবককে হাতের কাছে পেয়েও বিশেষ কোনো ব্যবস্থা না নিয়েই তিনি তাকে ছেড়ে দেন— যেন এই ঘটনাটি বাইরে ফাঁস হয়ে তাদের ভিতরকার দ্বন্দ্বকে অধিকতর তীব্র করে তুলতে না পারে। যাহোক, বাংলাদেশকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে ভারতের যে অসুবিধাগুলো ছিলো সেগুলো অনেকটাই আন্তর্জাতিক রাজনীতির ফলে উদ্ভুত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারতের জন্য বহুমুখী সংকট তৈরি করেছিল— একদিকে অব্যাহত শরণার্থীর ঢল (প্রায় এক কোটি শরণার্থীর চাপ ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ওপর গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল), অন্যদিকে এই শরণার্থীদেরকে তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য বাংলাদেশে একটি শান্তিপূর্ণ অবস্থা তৈরির বাধ্যবাধকতাও ছিলো। কিন্তু সেই অবস্থা কীভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব? জানা যায়— জুলাই-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারত আশা করেছিল যে, আমেরিকার 'যাদুদণ্ডে ' পাকিস্তানের "অভ্যন্তরীণ" সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান হবে, কিন্তু ওই সময়ের পরপরই তারা বুঝে যায়— এটি আদৌ সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া তাদের জন্য ভিন্ন কোনো পথ খোলা ছিলো না। কারণ এক কোটি শরণার্থীর চাপ কোনো দেশের পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে সামাল দেয়া অসম্ভব। কিন্তু সক্রিয় সহযোগিতা করার অন্য বিপদও ছিলো। মুক্তিযুদ্ধে চীন পাকিস্তানের পক্ষ নেয়ায়, ভারত যদি এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তাহলে চীনের পক্ষ থেকেও আক্রমণের আশংকা ছিলো। ফলে তাদের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল একটি বৃহৎ শক্তির সমর্থন। আমেরিকা আগে থেকেই জেনারেল ইয়াহিয়া তথা পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে বসেছিল— তারা ইয়াহিয়াকে ব্যবহার করছিলো চীনের সঙ্গে তাদের সম্পর্কোন্নয়নের দূত হিসেবে। বাকি থাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন সরাসরি এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে প্রথমদিকে আগ্রহ পোষণ করেনি। তার পেছনে কারণও ছিলো। সময়টি ছিলো ঠাণ্ডা যুদ্ধের এবং পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দুই শীর্ষ নেতার মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছিলো ওই সময়। ফলে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ওই আলোচনার পরিবেশ নষ্ট করতে রাজি ছিলো না তারা। কিন্তু ভারতের অব্যাহত চেষ্টায় তারা পাকিস্তানের নিপীড়ন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং ভারতের শরণার্থী সমস্যার ব্যাপারে মনোযোগ দেয়। বাংলাদেশের নেতৃত্বও এই সুযোগে সোভিয়েত সহানুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে প্রধানত বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে একটি সর্বদলীয় সরকার গঠনের উদ্যোগ নেয়। এটিও তাজউদ্দিনের দূরদর্শী সিদ্ধান্ত ছিলো— যদিও তাঁর এই চেষ্টা সর্বাংশে সফল হয়নি, বরং দলের ভিতর থেকে প্রবল বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল— যার কথা আগেই বলেছি। আওয়ামী প্রভাব খর্ব করার অভিযোগ তুলে আওয়ামী লীগের নেতারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে অবস্থান নেয় এবং অবশেষে সর্বদলীয় উপেদেষ্টা কমিটি গঠনের মধ্যে বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকে। অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সহানুভূতি ও সহযোগিতা পাবার জন্য এই উদ্যোগটিই সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে। বলা প্রয়োজন যে, সোভিয়েত সমর্থন লাভের জন্য ভারতের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অনস্বীকার্য, কিন্তু ভারত যতোটা না বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য সমর্থন চেয়েছে তারচেয়ে বেশি চেয়েছে 'শরণার্থী সমস্যা' সমাধানের সমর্থন। যাহোক, সোভিয়েতের এই সমর্থন এত তীব্র ছিলো যে, নভেম্বর-ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের চাপে নিরাপত্তা পরিষদে মোট তিনবার সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

াব উত্থাপিত হলে তিনবারই সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটোতে তা বাতিল হয়ে যায়। সোভিয়েতের এই সমর্থনে ভারত যেমন সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সাহস ফিরে পায় তেমনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধও অবিশ্বাস্যভাবে গতি লাভ করে। সোভিয়েতের এই ভূমিকায় আমেরিকা ক্ষিপ্ত হয়ে পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি দিতেও ছাড়েনি, যদিও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই হুমকির জবাবে নিরুত্তর থাকে। অবশেষে বাধ্য হয়ে— নিজ দেশের জনসমর্থন বা আন্তর্জাতিক সমর্থনের তোয়াক্কা না করেই— আমেরিকা বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্য সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে চীনের সমর্থনের আশায় এই নৌবহরকে চলতি পথে ২৪ ঘন্টার জন্য নিশ্চল করে ফেলা হয়। শেষ মুহূর্তে চীন— বিষয়টি নিয়ে তারা আরেকবার নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা করতে আগ্রহী, সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে আগ্রহী নয়— জানালে মার্কিন নৌবহর আবার যাত্রা শুরু করে, কিন্তু ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে! যেখানে প্রতিটি মুহূর্তই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, বাঙালি যখন তার বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত, পাকিস্তানি বাহিনী কার্যত অবরুদ্ধ তখন এই ২৪ ঘন্টা সময় বাংলাদেশকে একটি অসাধারণ বিজয়ের স্বাদ এনে দেয়। মার্কিন নৌবহর পৌছানোর আগেই পাকিস্তানি বাহিনী নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এই আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট জানা না থাকলে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের নেতৃত্বের সামর্থ্য-যোগ্যতা-দূরদর্শীতা ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধেও কিছু বোঝা যাবে না। লেখকের মতে : 'সূচনায় যা ছিলো পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সংকট, তা পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বলদর্পী বুদ্ধিভ্রংশতায় উপমহাদেশীয় সংকটে পরিণত হয় এবং মার্কিন প্রশাসনের ন্যায়নীতি বিবর্জিত পৃষ্ঠপোষকতা ও ভ্রান্ত পরামর্শের ফলে এই সংকটের জটিলতা ও পরিসর দ্রুত বৃদ্ধি পায়। মার্কিন প্রশাসনের চিরাচরিত বিশ্ব পাহারাদারীর মনোবৃত্তির প্রভাবে পাকিস্তানের আট মাস আগের অভ্যন্তরীণ সংকট বিশ্ব সংঘাতের রূপ নেয়।'

আর এই 'বিশ্ব-সংঘাত'কে মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করার কেন্দ্রে যিনি ছিলেন, তাঁর নাম— তাজউদ্দিন আহমদ। বঙ্গবন্ধুর যাদুকরী নেতৃত্বে বাংলাদেশকে একটি অনিবার্য মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার জন্য তৈরি করা, বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের মাধ্যমে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা, মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ও তাঁর সহকর্মী সেক্টর কমান্ডারদের বিচক্ষণ সামরিক নেতৃত্ব, সারাদেশে অগুনিত মুক্তিযোদ্ধার দুঃসাহসিক লড়াই, অপরিসীম আত্মত্যাগ ও জীবনদান, জনগণের বিপুল সমর্থন ও স্বাধীনতার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগের মানসিকতা— এই সমস্তকিছুর প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়েও একথা বলা বোধহয় অতিশয়োক্তি হবে না যে, তাজউদ্দিন আহমদের মতো একজন রাজনৈতিক ও দার্শনিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন নেতা না থাকলে আমাদের পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ করা প্রায় অসম্ভব হতো।

তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার আরেকটি প্রমাণ পাওয়া যায় স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর তিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সপ্তাহের প্রধানমন্ত্রীত্বকাল বিবেচনা করলে। বাংলাদেশ সরকারের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যেই যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু করার জন্য তিনি সড়ক যোগাযোগ, রেল যোগাযোগ ও বন্দর সচল করা, ডাক বিভাগ চালু করা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা, সেনাবাহিনীর রূপরেখা প্রণয়ন করা ইত্যাদিতে সফল হন। কিন্তু সেইসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতিগত সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন তিনি— গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরেপেক্ষতাকে মুক্তিযুদ্ধের এবং স্বাধীন বাংলাদেশের সকল কর্মকাণ্ডের মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করে নতুন দেশ গঠনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সহায়তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। দেশগঠনে সহায়তার নামে যুক্তরাষ্ট্র যে তার সাম্রাজ্যবাদী থাবা বিস্তার করার চেষ্টা করবে সেটি তিনি পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। মর্মান্তিক বিষয় হলো— বঙ্গবন্ধু দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তাজউদ্দিনের এই মৌলিক নীতিটি পরিত্যক্ত হয়। বস্তুত বঙ্গবন্ধুর শাসনকালে তাজউদ্দিন আহমদ একরকম উপেক্ষিতই ছিলেন। আর, আমার নিজের মতে, তাঁকে উপেক্ষা করাই ছিলো শেখ মুজিবের জীবনের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ভুল। তাজউদ্দিন আহমদের মতো একজন দার্শনিক-প্রজ্ঞাবান সহকর্মীকে দূরে সরিয়ে রাখার ফলেই বঙ্গবন্ধুর চারপাশে ডানপন্থীদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে— আর এর ফলাফল আমাদের সবারই জানা।

আরেকটি বিষয় উত্থাপন করে এই প্রসঙ্গ শেষ করবো।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত প্রথম থেকেই নানাভাবে সহায়তা করেছিল, যেমন— শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেয়া, প্রবাসী সরকারের কার্যক্রম চালানোর জন্য ভারতীয় ভূমি ব্যবহারের অনুমতি দেয়া, এমনকি সামরিক কর্মকাণ্ড চালানোর অনুমতি দেয়া, আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের জন্য সহায়তা করা, আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ঝুঁকি সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি জড়িয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়া ইত্যাদি। ভারতের এইসব সহযোগিতা ছাড়া বাংলাদেশের পক্ষে এত দ্রুত জয়লাভ করা কঠিন হতো— এ কথা অনস্বীকার্য, কিন্তু এ-ও মনে রাখা দরকার যে, ২৬ মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারই পাকিস্তানিদের ব্যতিব্যস্ত রেখেছিল, নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল, ওদের মনোবলকে নিয়ে এসেছিল শূন্যের কোঠায়। এবং এটা না করতে পারলে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাত্র ১২ দিনের মাথায় পাকিস্তানিদের পরাজিত করা ভারতীয়দের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব হতো না। উল্লেখ্য যে, ভারতীয় স্থলবাহিনী বাংলাদেশে অভিযান শুরু করে ৪ ডিসেম্বর ১৯৭১, এবং আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয় ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। মুক্তিযোদ্ধাদের দুঃসাহসিক অভিযানে পাকিস্তানিরা যখন পলায়নপর এবং মানসিকভাবে পরাজিত, তখন ভারতীয় বাহিনীর অংশগ্রহণ তাদের এই পরাজয়কে কেবল তরান্বিত ও অনিবার্য করে তুলেছিল। *মূলধারা '৭১* গ্রন্থে লেখক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের এইসব দুঃসাহসিক অভিযান ও তার ফলাফলের বিস্তারিত বিবরণ দেননি, তাঁর মনোযোগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন্দ্রে ছিলো প্রবাসী সরকারের কর্মকাণ্ড ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি— ফলে এই গ্রন্থটিও মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। তবে একটি অজানা অধ্যায়ের উন্মোচন করে তিনি আমাদেরকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। নতুন প্রজন্মের পক্ষ তাঁকে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই।

৩

ওপরে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকারের কর্মকাণ্ড এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ সম্বন্ধে আলোচনাটুকু করেছি একটি বিশেষ কারণে। যেসব দল/সংগঠন/ব্যক্তি যুগ যুগ ধরে তথাকথিত ঘোষণা-বিতর্ক চালিয়ে আসছেন, তাদের কণ্ঠে কখনোই প্রবাসী সরকার বা তাজউদ্দিন ও তাঁর সহকর্মীদের ভূমিকা প্রসঙ্গে কিছু শোনা যায়নি! ওই সময় মুক্তিযুদ্ধের মূল নেতৃত্বে কে বা কারা ছিলেন এবং তাঁরা কোন পদ্ধতিতে কাজ করেছেন, সেটিও তাই অজানাই থেকে যায়। বাংলাদেশের প্রথম সরকার বা যুদ্ধকালীন বিপ্লবী সরকারের কর্মকাণ্ডের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ও ইতিহাস কারচুপির কবলে পড়ছে! রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম আর পাঠ্যপুস্তকে এসব বিষয়ে কোনো কথাই বলা হয় না! কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটুকু থেকেই কি মনে হচ্ছে না যে, প্রবাসী সরকারের দৃঢ়চিত্ত ভূমিকা ছাড়া স্বাধীনতা অর্জন করা প্রায় অসম্ভব হতো! এই ইতিহাস যে রাষ্ট্রযন্ত্র অবহেলা করে, সে যে জনগণের দিকে ফিরেও তাকাবে না সেটি আর অস্বাভাবিক কী? তবু আমাদেরকে কথা বলে যেতে হবে। কারণ, শুধুমাত্র নেতৃত্বের ইতিহাস জেনে মুক্তিযুদ্ধের মর্মার্থ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়! ইতিহাস নিয়ে রাষ্ট্রীয় তরফের আলোচনায় নির্যাতিত নারীরা উপেক্ষিত থাকে কেন, যুদ্ধশিশুরা উপেক্ষিত থাকে কেন, বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধারা উপেক্ষিত থাকে কেন, জনগণ উপেক্ষিত থাকে কেন— সে প্রশ্ন অতি অবশ্যই আমাদের উত্থাপন করতে হবে। রাষ্ট্র কী তাদের দিক থেকে স্থায়ীভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে? রাষ্ট্র কী তাদের কথা বলতে লজ্জা পায়? রাষ্ট্র কী তাদের অবদানের কথা অস্বীকার করতে চায়? শুধু নিজেদের নিয়ে আলোচনা করে তারা কী স্থায়ীভাবে ইতিহাস কারচুপি করতে চায়? এসব প্রশ্ন না তুললে প্রকৃত ইতিহাস চাপা পড়ে যাবে চিরদিনের জন্য, প্রকৃত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা তখন অধিকতর কঠিন হয়ে পড়বে।

রচনাকাল : এপ্রিল, ২০০৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~